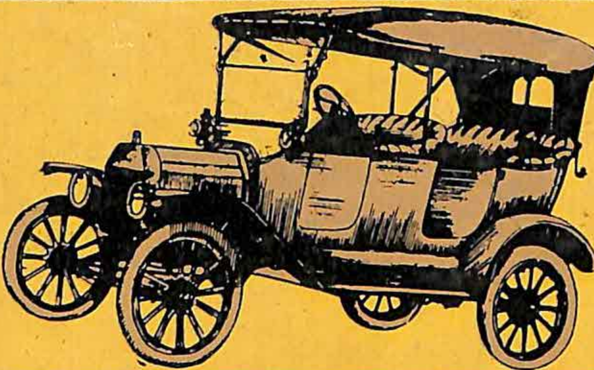
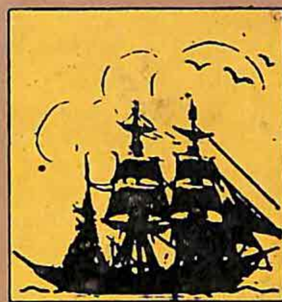








পালকি থেকে পাতালরেল

সন্তোষ চট্টোপাধ্যায়



পালকি থেকে পাতাল রেল

সন্তোষ চট্টোপাধ্যায়

দে'জ পাবলিশিং ॥ কলকাতা ৭০০০৭৩

প্রথম প্রকাশ :
বইমেলা
ফেব্রুয়ারী ১৯৯০
মাঘ ১৩৯৬

প্রকাশক
সুধাংশুশেখর দে
দে'জ পাবলিশিং
১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০০৭৩

মুদ্রাকর
কাননশ্রী পয়ড়্যা
অভিনব মুদ্রণ
৭৪, হরিঘোষ ষ্ট্রীট
কলকাতা-৭০০০০৬

প্রচ্ছদ : গৌতম রায়

দাম : ২০ টাকা
Rupees Twenty only

কলকাতাকে যারা ভালোবাসে

তাদের সকলের হাতে

সামান্য দুটো কথা

কলকাতা আমাদের সবার কাছেই দারুণ প্রিয় তাই না ? কলকাতা ছেড়ে দু'দিন কোথাও গেলেই আমাদের মন কেমন করে। কলকাতার হাজারো সমস্যা, থাকবার সমস্যা, চলার সমস্যা, কাজ করার সমস্যা, এমনই কত কি সমস্যা। এর মধ্যে আমরা সবচেয়ে কষ্ট বোধ করি বোধ হয় পরিবহন সমস্যায়, তা সে স্কুল কলেজ যেতেই হোক বা কাজে কর্মে যেতেই হোক। ট্রাম, বাস, ট্যাক্সি, অটো, রিকশ, পাতাল রেল, চক্ররেল এত কিছু থেকেও কিন্তু সেই ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই দৃশ্য।

কলকাতার সেই পরিবহনের চরিত্র আর ইতিহাসকেই তুলে ধরতে চেয়েছি বইটিতে। এ ইতিহাস যেমনই মজার তেমনই আবার শিক্ষণীয় তো বটেই। ধীরে ধীরে কলকাতা যেমন হাঁটি হাঁটি পা পা করতে করতে বেড়ে উঠেছে, তারই সঙ্গে বদলে গেছে তার পরিবহনেরও চরিত্র, বদলেছে শহর, বদলেছে পথঘাট।

যাদের জন্য এই রচনার প্রয়াস তাদের যদি কণামাত্রও ভাল লাগে, কলকাতাকে তারা যদি ভালবাসতে পারে আরও বেশি করে তাহলেই আমার পরিশ্রম সার্থক।

এই বই রচনার কাজে সবথেকে বেশি সাহায্য পেয়েছি পত্র প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগারিক শ্রীশৈলেন পালের কাছ থেকে। তাকে আমার কৃতজ্ঞতা জানাই। ইতি—

সন্তোষ চট্টোপাধ্যায়

পালকি থেকে পাতাল রেল

● এক ●

কলকাতা কি করে হলো

পালকি থেকে পাতাল রেল।

পালকিতে যার শুরু তাই আপাতত শেষ হয়েছে এই পাতাল-রেলে। কলকাতা শহরের যানবাহনের ইতিহাস তো এরই মাঝে লুকিয়ে আছে।

কিন্তু আপাতত বলতে চাইছি কেন? কারণ ঠিক এই মুহূর্তে, আমাদের সামনে রয়েছে এই পাতাল রেলেরই হাতছানি। কিন্তু কে বলতে পারে পাতাল রেলের পরেও মানুষ, আমাদের এই প্রিয় শহর কলকাতার মানুষ, খুঁজে পাবে না আরও নতুন কোন যানবাহন? সে কথার উত্তর দেবে অবশ্য ভবিষ্যত।

আর এটাই তো যুগের ধারা—একেই তো বলি বিবর্তন। কয়েক'শ বছর আগের দিকে একবার তাহলে তাকাও। এই কলকাতা শহরের আদিতে, তার শৈশবের দিনগুলোয় শহরবাসীর যাত্রা শুরু হয়েছিলো হাঁটি হাঁটি পা পা করেই। তখন তারই প্রয়োজনে আর চলার কষ্ট লাঘব করারই তাগিদে এসেছিলো পালকি। মানুষই যা বয়ে নিয়ে চলতো।

কলকাতার জয়যাত্রা কিন্তু শুরু হয় তখনই—প্রায় তিনশ বছর আগে। তারপর?

তারপর পালকির দিন একে একে কবে যেন শেষ হয়ে গেলে এল তার বিকল্প। এলো যান্ত্রিক শকট। মানুষ আস্তে আস্তে স্বাভাবিক নিয়মেই একেবারে ভুলে গেলো পালকির কথা।

এই বিচিত্র বিবর্তনের ধারা বয়ে চলেছে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই। যান বাহনও তার ব্যতিক্রম নয়। কলকাতা নিজেও তো কেমন বদলে গেলো—বদলে গেলো তার পরিবেশ, তার বিপুল নগরবাসীরা, তার চিন্তাধারা, শিক্ষা আর সব কিছুই। এর মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে কত সুখ দুঃখের এক ইতিহাস।

পৃথিবী যে এই ভাবেই এগিয়ে চলেছে, বয়ে চলেছে তার জীবনধারা।

তাই কলকাতা শহরের বুকে পালকির যুগ শেষ হয়েছে,, শেষ হয়েছে আরও কত যুগ, কত উত্থান, পতন, কত বৈচিত্র্য পার হয়ে কলকাতা এসে পৌঁছেছে তার বর্তমানে। কলকাতায় শুরু হয়েছে অতি আধুনিক সেই

পাতাল রেলের যুগ। পৃথিবীর আরও কিছু বড় বড় শহরের মত কলকাতাও সেই গৌরব পেয়েছে।

হঁ্যা, কলকাতাতেই যে ভারতের মধ্যে সর্ব প্রথম চালু হয়েছে আজ পাতাল রেল।

কিন্তু পাতাল রেল চালু হলেও পরিকল্পনাটি পুরোপুরি রূপায়িত হয়নি এখনও—এখনও চলেছে সেই কর্মযজ্ঞ। হয়তো আরও কিছুদিন সময় গড়িয়ে যাবে এর মধ্যে। তারপর যেমন চলেছে সেইভাবেই পাতালের গভীরে লক্ষ লক্ষ মানুষ যন্ত্র দানবের বুকে আশ্রয় নিয়ে ছুটে চলবে তার গন্তব্যস্থলে—দমদম থেকে টালীগঞ্জ।

কিন্তু না, আমরা এখনই এতোখানি দ্রুত এগিয়ে যেতে চাই না।

তাহলে?

তাহলে এই দীর্ঘ পথ পার হওয়ার ইতিহাসই একটু আগে আলোচনা করে নিই, এসো। এসো ধাপে ধাপে এগিয়ে আমরা দেখে নিই কেমন করে, কী ভাবে কালের স্রোতে কলকাতার যানবাহনের মধ্যে ঘটে গেল বিবর্তন। কেমন করে মানুষ পালকির আশ্রয় ছেড়ে আজ বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষতার মধ্যেই খুঁজে পেলো তার শান্তি আর নির্ভরতার নীড়—আগামী দিনের পাতাল রেল।

কিন্তু কেন কলকাতার মানুষ নির্ভর করতে চলেছে পাতাল রেলের উপর? কিসের সেই নির্ভরতা?

প্রশ্নটা ঠিক সন্দেহ নেই।

এর উত্তর পেতে হলে আমাদের জানতে হবে কলকাতার সমস্যা কি? কেন কলকাতার বুকে এত পরিশ্রম আর বিপুল অর্থ খরচ করে বসাতে হল এই পাতাল রেল।

কিন্তু এর মধ্যেও রয়ে গেছে আরও একটা কথা। সেই কথাটা হলো কলকাতার গড়ে ওঠার কথা, তার বিস্তার আর জনসংখ্যার কথা।

এ কথা কেন জানা দরকার জানো? এটা জানা দরকার এই কারণেই যে এরই মধ্যে লুকিয়ে আছে আমাদের সমস্ত প্রশ্নেরই সঠিক উত্তর। আর তাই প্রথমেই আমাদের জানা চাই কলকাতা শহরের, আমাদের এই প্রিয়তম শহরের সৃষ্টি আর ধাপে ধাপে বেড়ে ওঠার ইতিহাস।

সে কাহিনী রোমাঞ্চকর উপন্যাসেরই মত।

কলকাতা শহরটা একদিনে বেড়ে ওঠেনি। আর সে ইতিহাসও যেকারণেই রোমাঞ্চকর।

ঠিক সেই ইংরাজী প্রবাদের মত—'রোম ওয়াজ নট বিলট্ ইন এ ডে'। অর্থাৎ রোম একদিনে তৈরি হয়নি।

রোম শহরের কথাতো তোমরা সকলেই শুনেছো। হঁ্যা, পৃথিবীর

প্রাচীনতম কোন শহরের নাম বললে রোমের কথাই সবার আগে মনে পড়া স্বাভাবিক। হাজার হাজার বছরের পুরানো শহর এই রোম।

আশ্চর্য কথা হলো, পৃথিবীর প্রাচীনতম এই রোম শহরের সঙ্গে আমাদের সকলের প্রিয় শহর কলকাতার কোথায় যেন একটা মিল রয়ে গেছে। দুটির সমস্যাই যেন এক। রোমের মত কলকাতা শহরটাও বেড়ে উঠেছে যদৃচ্ছ, এলোমেলো ভাবে আর তাই নানা সমস্যাও তাদের ঘিরে রেখেছে চিরকাল ধরে।

তবে, এর মধ্যেও একটু ভাববার বিষয় আছে।

বিষয়টা হলো, রোম আর কলকাতার বয়সের কথা। রোম শহরের জন্ম হয় হাজার হাজার বছর আগে। কত উত্থান পতন আর ঝড় ঝঞ্জার সাক্ষী সে। এর পত্তন করেন রেমাস ও রোমুলাস নামে দুই ভাই, যারা নেকড়ে মায়ের কাছে মানুষ।

আর সে তুলনায় কলকাতা শহরের বয়স অনেক অনেক কম—মাত্র তিনশ বছর। কিন্তু তাই বলে কলকাতার সমস্যা কম নয়। আর লোক সংখ্যা? লোক সংখ্যার তুলনায় রোম কলকাতার কাছে একেবারে শিশু।

কিন্তু আমরা একটু দূরেই চলে এসেছি আমাদের বক্তব্য ছেড়ে। এ সম্বন্ধে আমরা আবার পরে আলোচনার সুযোগ পাবো, তখন দেখবো কলকাতা শহরটার আসল সমস্যা কোথায়। আর তার সঙ্গে এর যানবাহন ব্যবস্থা কি ভাবেই বা জড়িত আছে!

তাহলে এবার আমাদের আলোচনা কী সম্বন্ধে?

আমাদের আলোচনা হলো কলকাতা শহর কী ভাবে কেমন করে তৈরি হলো, আর তারপর আস্তে আস্তে আজকের এই রূপ পেলো সে।

এবার সে কথাতেই চলো আসা যাক।

এবার কলকাতার পুরানো ইতিহাস একটু দেখা যাক।

সুতানুটী, গোবিন্দপুর ও কলিকাতা।

অনেক, অনেক কাল আগেই হুগলী নদীর পুব দিকে তিনটে গ্রামের অস্তিত্ব ছিলো। সেই গ্রাম তিনটির নাম হলো সুতানুটী, গোবিন্দপুর আর কলিকাতা। তিনটি গ্রামই বলতে গেলে নগণ্য গ্রাম বলা যায়।

প্রায় পনেরো শতকে, ভারতবর্ষে যখন মোগল সম্রাটরা জাঁকিয়ে রাজত্ব করছিলেন তখনও গ্রাম তিনটের নাম শোনা যায়। এমন কি সেই সম্রাট আকবরের সময়েও ছিলো। আইন-ই-আকবরী'তেও তাই এই নামটা মেলে, আবুল ফজল যার লেখক।

এই তিনটে গ্রামের নাম বলতে চাইছি কেন?

আসলে ওই তিনটে গ্রাম নিয়েই যে গড়ে ওঠে আজকের এই শহর কলকাতা।

নামগুলোর মধ্যে বেশ মজার ইতিহাসও লুকিয়ে আছে। আসলে এর

মধ্যে আবার নানা মুনির নানা মতেরও অভাব নেই। সুতানুটী নাম কেন হলে জানো? অনেকেই বলেন সেখানে এক সময় বসতো সুতোর হাট। সুতো অর্থাৎ সুতোর নুটি বা গুলি থেকেই আসে এরকম নাম।

সুতানুটী গ্রাম ছিলো আজকের কলকাতার একেবারে উত্তর দিকে। কোন কোন সময় 'ছুত্তান্নটি' বলেও উল্লেখ শোনা গেছে।

সুতানুটী আর কলকাতা ছাড়া বাকি রইলো আর গোবিন্দপুর।

এই তিনটে গ্রাম মিলেই শেষ পর্যন্ত গড়ে উঠলো আজকের কলকাতা শহর—তিনের মধ্যে রয়ে গেলো কিন্তু 'কলকাতা' নামটাই।

গোবিন্দপুর কেমন করে হলো দেখলে নিশ্চয়ই আপত্তি হবে না। বর্তমান চৌরঙ্গী এলাকার অধিকাংশ—যেমন ফোর্ট উইলিয়াম আর এসপ্লানেড এলাকা নিয়েই গড়ে উঠেছিলো চৌরঙ্গী। এর প্রায় ১১০০ বিঘা জমির মধ্যে ৫৭ বিঘা আন্দাজ জমিতে লোকজন বাস করতো। কিছু ধনী বণিক বা শেঠ এই এলাকায় নাকি স্থাপন করেছিলেন গোবিন্দজীর মন্দির—এঁরই নামে জায়গাটার নাম হয়ে যায় গোবিন্দপুর।

'চৌরঙ্গী' নামটা তো আমাদের খুবই পরিচিত। এ থেকেই বুঝতে পারা যায় জায়গাটা বেশ পুরনোই—তাই না?

আশ্চর্য কথা হলো ঊনিশ শতকের গোড়ার দিকেও কিন্তু 'চৌরঙ্গী' আলাদা গ্রাম বলেই প্রায় পরিচিত ছিলো। খুব প্রাচীন নথীপত্রের মধ্যেও আবার এই 'চৌরঙ্গী রোড' নামটারও উল্লেখ মেলে। প্রাচীন নথিপত্রে অবশ্য বলা হয়েছে এসপ্লানেডমুখী রাস্তাই হলো 'চৌরঙ্গী রোড'; আবার চৌরঙ্গীর দক্ষিণে ছিলো 'ডিহি বিরজি' গ্রাম। তারও দক্ষিণে গেলে 'ডিহি চক্রবেরিয়া'—অর্থাৎ আজকের যেটা চক্রবেরিয়া এলাকা।

মজার তর্ক লেগেছিলো কিন্তু কলিকাতা বা কলকাতা নামটা নিয়েই। এ রকম নাম কেন হলো জায়গাটার? কলিকাতা ছিলো বড়বাজার অঞ্চলে।

হ্যাঁ, এটা একটা প্রশ্ন বটে।

তখনও কিন্তু কালীঘাটের অস্তিত্ব ছিলো? হ্যাঁ, সেটা ছিলো বটে। আর তাই থেকেই যে অনেকের মত কলকাতা নামের উৎপত্তি।

আসলে কিন্তু তা নয় বলেই ভেবে নেওয়া যায়। কলকাতায় নাকি এক সময়ে ছিলো চুণ তৈরির ব্যবস্থা। আর তাই থেকেই হয়ে দাঁড়ালো কলি-চুণের কাতা বা কলিকাতা।

কিন্তু এ নিয়ে পণ্ডিতেরা তর্কে মাতুন আমাদের আপত্তি নেই। আমরা আমরা শুধু জানতে চাই কলকাতা শহরটা গড়ে উঠতে শুরু করলো কবে থেকে আর কারাই বা সেটা করলো।

হ্যাঁ, এ কথার আলোচনা করতে গিয়ে আরও কিছু ইতিহাসের পাতা উল্টে পাল্টে দেখতে হবে যে।

গোবিন্দপুর গ্রামের প্রায় অর্ধেকটাই ছিলো ধানক্ষেত আর বাকি অর্ধেকটার বেশির ভাগই খাস খানাডোবা আর বনজঙ্গল। সেখানে দিনের বেলাও বুনো জন্তু জানোয়ারের দেখা সাক্ষাৎ মিলতো ।

ব্যাপারটা আজকের এই কলকাতার সঙ্গে একটু মিলিয়ে নিলে কেমন মনে হয়? খুবই মজার, তাই না ?

কলকাতা নিয়ে গল্পের কিন্তু শেষ নেই ।

কেউ কেউ আবার কি বলে থাকেন জানো ? কলকাতা নাকি কোন এককালে ছিলো 'কোল' নামের কিছু আদিবাসীদের বাসস্থান। আর তাই 'কোল'দের বাস অর্থাৎ 'কাতা' থেকে একসঙ্গে জুড়ে হয়ে গেলো 'কলকাতা' ।

তাছাড়া আরও মজার মজার কাহিনী আছে ।

সে কাহিনী কী রকম জানতে ইচ্ছে করছে ?

বেশ, তাহলে শোনো যাক এসো। তবে সবটাতেই কিন্তু যাকে বলে নানা মুনির নানা মত ।

এর একটা কাহিনী এবার শোনো ।

কোন এক সাহেব নাকি শহরে এসে সুতো কাটতে ব্যস্ত এক বুড়িকে জায়গাটার নাম জিজ্ঞেস করে। বুড়ি ভেবে নেয় সাহেব বুঝি সুতো কবে কাটা হয়েছে তাই জিজ্ঞেস করছেন। বুড়ি তাই জবাব দিলো 'কাল কাটা' অর্থাৎ সব সুতো গতকাল কাটা হয়েছে। মজার ব্যাপার হলো সাহেব ধরে নিলেন জায়গাটার নাম 'কালকাটা' আর তাই এই কালকাটাই কালে কালে হয়ে উঠলো আজকের কলকাতা ।

আরও মজার কথা, সুখে কাল কাটানো যায় বলেই নাকি এই শহরটার নাম হয়ে উঠেছিলো কালকাটা অর্থাৎ কলকাতা ।

তবে সে যাই হোক কলকাতা নাম অনেক অনেক কালই আগের তাতে আর কোন সন্দেহ নেই যাই বলো। বিপ্রদাসের মনসামঙ্গল কাব্যেও এর উল্লেখ আছে। কেমন ভাবে দেখ ঃ

চিৎপুরে পূজে রাজা সর্বমঙ্গলা ।
নিশিদিশি বাহে ডিঙা নাহি করে হেলা ॥
তাহার পূর্বকূল বাহিয়া এড়ায় কলিকাতা
বেতরে চাপায় ডিঙ্গা চাঁদ মহারথা ॥

আবার দেখ শুধু মনসামঙ্গলই নয়, কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গল কাব্যেও 'কলকাতার' নাম আছে। এই ভাবে ঃ

ধালি পাড়া মহাস্থান কলিকাতা কুচিনান
দুই কূলে বসাইয়া বাট ।
পাষানে রচিত ঘাট দু'কূলে যাত্রীর নাট
কিঙ্করে বসায় নানান হাট ॥

কলকাতা শহরের গোড়াপত্তনের কথা আলোচনা করতে গেলে তাই আমরা ইতিহাসের সেই পাতা উল্টেই দেখতে পাই এটা করেছিলেন বিদেশী বণিক কোম্পানীর প্রতিনিধিরাই।

হ্যাঁ, ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর লোকজন। তারা তখন জাঁকিয়ে বসেছিলো।

জাহাঙ্গীর, হ্যাঁ সেই মোগল বাদশাহ জাহাঙ্গীরের আমলে ইংলন্ডেশ্বরীর পরিচয় পত্র নিয়ে ভারতে এসেছিলেন তার দূত স্যার টমাস রো। আর লাভ করেছিলেন ভারতে বাণিজ্য করার বাদশাহী ফরমান।

তখনই এর শুরু। তারপরের ইতিহাস তো সকলেরই জানা, বণিকের মানদণ্ড একদিন কালে কালে হয়ে উঠেছিলো রাজদণ্ড।

কিন্তু আমরা আসল বক্তব্য থেকে সরে যাচ্ছি না তো? মোটামুটি তা নয়। কারণ আগের ইতিহাস না জানলে সব উপলব্ধি করা যাবে না।

আমাদের মূল জানার কথা হলো কলকাতা শহরের উৎপত্তির ইতিহাস।

আর তাই সেকথা জানতে গেলে ওই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীরই একজন প্রতিনিধির কথাই আমাদের জানা চাই।

কে তিনি? কলকাতা নিয়ে তাকেই বা দরকার কেন?

সঙ্গত প্রশ্ন।

সেই ইংরেজ প্রতিনিধির নাম জোব চার্নক।

হ্যাঁ, কলকাতার প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে এই ইংরেজ জোব চার্নকই ইতিহাসে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন। কলকাতা নিয়ে আলোচনা করতে গেলে তাই জোব চার্নকের নাম আলোচনা করতেই হবে।

এবার তাহলে এসো জোব চার্নকের সম্পর্কেই কিছুটা জানার চেষ্টা করা যাক, কিভাবে, কেমন করে তিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন আমাদের সকলের প্রিয় শহর এই কলকাতা। শহর প্রতিষ্ঠার পরেই তবে যানবাহনের কথা।

জোব চার্নক ছিলেন ভারতে বাণিজ্য করতে আসা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর একজন কর্মচারী মাত্র।

সে যুগে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর চাকরি নিয়ে যারা ভারতে চলে আসতো তারা কিন্তু তেমন উঁচু বংশের মানুষ হতো না। ভারতে তারা মোটামুটি আসতো নিছক লুটপাট করে কিছু টাকা পয়সা আয় করারই মতলবে। চট করে বড় মানুষ হওয়ার জন্য।

জোব চার্নকও তার চেয়ে আলাদা কিছু নন।

জোব চার্নক ভারতবর্ষে এসেছিলেন ১৬৫৫-৫৬ সাল নাগাদ। তার বয়স তখন কতই বা? হয়তো ১৯।২০ বছরই হবে। চার্নক প্রথমে যোগ দিয়েছিলেন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর পাটনা কুঠিতে।

জোব চার্নক বসে থাকার মানুষ ছিলেন না। তিনি ওই সময় ১৬৮১ সালে

নবাবের গঙ্গারাম নামে একজন বিদ্রোহী জায়গীরদারের সঙ্গে লুটপাট করে মহানন্দে দিন কাটাতে থাকেন। কিন্তু তখন দিল্লীর সম্রাট ছিলেন স্বয়ং আওরঙ্গজেব। আওরঙ্গজেব গঙ্গারামের বিদ্রোহ দমন করতে পাঠালেন তার মামা, সেনাপতি সেই বিখ্যাত শায়েস্তা খাঁকে।

শায়েস্তা খাঁর নাম নিশ্চয়ই শুনেছো? হ্যাঁ, তারই সময় বাঙলায় পাওয়া যেত টাকায় আট মণ চাল।

শায়েস্তা খাঁর তাড়া খেয়ে এবার কিন্তু পালাতে হলো জোব চার্নককে। তিনি কোথায় পালালেন জানো? তিনি পাটনা ছেড়ে পালিয়ে এলেন একেবারে বাংলাদেশে—হুগলীতে। ইংরেজদের সঙ্গে সংঘর্ষ চলতেই থাকলো এরপর।

এরপর কিন্তু হুগলী থেকেও চার্নক সাহেবকে পালাতে হলো একেবারে কাশিমবাজার। নবাবের সেনাদের তাড়া খেয়েই তিনি পালিয়ে ছিলেন।

জোব চার্নক এর মধ্যে বেশ একটু সমাজসেবার কাজও করে ফেলেন। এ সম্বন্ধে বেশ একটা কাহিনীও শোনা যায়।

ব্যাপারটা হলো, চার্নক পাটনায় সতীদাহের হাত থেকে এক হিন্দু মেয়েকে বাঁচিয়েছিলেন। শোনা যায় তাকেই বিয়ে করেছিলেন চার্নক। চার্নকের স্ত্রীর নাম জানা যায় মারিয়া। তাঁর তিন মেয়ে, মেরি, এলিজাবেথ ও ক্যাথারিন।

ঔরঙ্গজেবের সেনাপতি খান-ই-জাহান কিন্তু তখনও তাড়া করে ফিরছিলেন চার্নককে।

চার্নকের ঘটনাবহুল জীবনের সব কথা তো সামান্য পরিসরে বলা যাবে না। তাই অল্প কথাতেই দেখি এসো, শেষ অবধি চার্নক কী করেছিলেন আর কী ভাবেই বা কলকাতার সঙ্গে তার নামটাও জড়িয়ে গেলো।

ইংরেজদের সঙ্গে শেষ পর্যন্ত কিন্তু রফা হলো মোগল বাদশাহের। আর তারই ফলে ইংরেজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী আবার অবাধ বাণিজ্যেরও অধিকার পেয়ে গেলো।

তারপর?

এরপরেই চার্নক আবার সুতানুটীতে ফিরে এলেন ২৪শে আগস্ট ১৬৯০ সালে। এই দিনটাকেই বলা যায় কলকাতার প্রতিষ্ঠা দিবস। এখানেই শেষ পর্যন্ত বাস করে চলেছিলেন চার্নক।

এইভাবেই তিনশ বছর আগের একটি দিনে কলকাতা শহরের জন্মলগ্ন ঘোষিত হলো। এ বছর কলকাতার তিনশ বছর পূর্তি উৎসব।

এরপর জোব চার্নক বেশিদিন অবশ্য বাঁচেন নি। তিনি মারা যান ১৬৯২ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই জানুয়ারী। সেণ্ট জন চার্চের এলাকায় সমাধিস্থ করা হয় জোব চার্নককে। সে সমাধি আজও আছে।

কলকাতা নামের এই মহানগরী গড়ে ওঠার ইতিহাস এই রকমই। তারপর কালের গতিতে গোবিন্দপুর, সুতানুটী আর কলিকাতা হয়ে দাঁড়ালো একদিন 'কলকাতা'। ১৬৯৮ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী একদিন মাত্র ১৩০০ টাকায় এই তিনটে গ্রাম কিনেও নিলেন বরিষার লক্ষ্মীকান্ত মজুমদারের বংশধরদের কাছ থেকে।

কলকাতার আদি ইতিহাস ছেড়ে চলো এবার দেখি কী করে এখানে গড়ে উঠলো বসতি আর তারই প্রয়োজনে সেখানে তৈরি হলো কেমন করে পথ ঘাট, আর ক্রমে এসে গেলো নানা ধরণের যানবাহন। সেই পালকিতে যার গোড়াপত্তন।

● দুই ●
কলকাতার পথ ঘাট

কলকাতা শহরের গোড়াপত্তন আসলে যার হাতে সেই ইংরাজ জোব চার্নক বিদায় নিয়েছিলেন দুনিয়ার মায়া কাটিয়ে ১৬৯২ খ্রীষ্টাব্দে এ কথা আগেই জেনেছো।

কিন্তু কলকাতা তখনও মোটেও কলকাতা হয়ে ওঠেনি। কলকাতায় মানুষের বাসও ছিলো নিতান্তই অল্প। তাছাড়া এখানে ওখানে ছড়িয়ে ছিলো অজস্র এঁদো ডোবা, পুকুর আর ইতস্তত বনজঙ্গলও। আর শহরের যত্রতত্র শোনা যেতো শেয়ালেরও ডাক। কলকাতা তখন নেহাতই গণ্ডগ্রাম মাত্র বলা যায়।

তা সত্ত্বেও ধীরে ধীরে কিন্তু এই শহরটার গুরুত্ব বাড়তেই শুরু করেছিলো।

সেটা কেন জানো?

সেটার কারণ হলো, ইংরেজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এখানে স্থাপন করেছিলো তাদের কুঠি আর কলকাতা হয়ে উঠেছিলো তাদের ব্যবসা বাণিজ্যের এক গুরুত্বপূর্ণ এলাকা।

আর এজন্য কী প্রয়োজন ছিলো?

এজন্য প্রয়োজন ছিলো ভালো বসবাসের এলাকা আর ব্যবস্থা। আর এছাড়া আরও কিছু। আর তা হলো নিঃসন্দেহে চলাচল আর যোগাযোগ ব্যবস্থা বজায় রাখার জন্য পথঘাট।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী কলকাতাকেই তাদের সদর দপ্তর করে নেওয়ায় অনেকেই কলকাতায় বাস করার ইচ্ছে পোষণ করতে চাইছিলেন। বিশেষ

করে যাদের সঙ্গে কোম্পানীর ব্যবসা বাণিজ্য ছিলো।

কিন্তু হলে হবে কি কলকাতায় তখনকার দিনে পথ বলতে কোন কিছুই যে ছিলো না। যা ছিলো তাও নিছক কাঁচা রাস্তাই।

কলকাতায় যারা প্রথম পদার্পণ করেছিলেন তারা কিন্তু এখানে এসেছিলেন জলপথে। হ্যাঁ, কলকাতায় আসার তখন সহজতম পথই ছিলো হুগলী নদীর উজানে পেঁছনো, যদিও কলকাতা তখনও বন্দর হিসেবে গড়ে ওঠেনি।

এখানেও কিন্তু কৃতিত্ব সেই জোব চার্নকের।

চার্নক মোগল বাহিনীর তাড়ায় জলপথেই হুগলী নদী বেয়ে এসে পড়েছিলেন, আর ওই সুতানুটীকেই যোগ্য জায়গা ভেবে নিয়েছিলেন বাসস্থান বা মোগল বাহিনীর হাত এড়িয়ে লুকিয়ে থাকার জায়গা হিসেবে। ইংরেজদের অধিকার করা মৌজা আর আশপাশের এলাকাকে নগর বললেও এর আশেপাশের জায়গাকেই কেবল কুঠি বলা চলতো।

এ থেকে আমরা একটা বিষয় পরিষ্কার বুঝে নিতে পারছি—আর তা হলো, জলপথই কলকাতায় আসার প্রথম পথ।

সুতানুটীর প্রথম উপনিবেশে কি ছিলো জানো?

সামান্য কিছু খড়ে ছাওয়া মেঠো ঘরবাড়ি আর সামান্য কয়েকটা ইঁটের তৈরি বাড়িও। ১৬৯০ সালে জোব চার্নক যখন এখানে বাস করতে শুরু করেন তখনও এর বেশি কিছই ছিলো না। অবশ্য কিছু কিছু ইঁটের তৈরি বাড়িও তৈরি হতেও আরম্ভ হয়। চার্নক নিজে যে বাড়িতে বাস করেছিলেন সেটা ছিলো সেকালের একজন জমিদারের কাছারী বাড়ি। আর সেখানে একটা গড় বা কেল্লাও গড়ে তুলেছিলেন চার্নক।

এবার আবার কলকাতার পথঘাটের কথায় ফিরে আসা যাক।

আমরা আলোচনা করছিলাম জলপথের কথাই। কারণ কলকাতায় আসার প্রধান উপায়ই ছিলো এই হুগলী নদীর জলপথ।

কিন্তু হুগলী নদী তো কলকাতা শহরের মধ্যে যাতায়াতের জন্য ব্যবহার হয়নি। হবে কি করে হুগলী নদীতো বয়ে চলেছে শহর কলকাতার পশ্চিম প্রান্ত বরাবর।

তাহলে শহরের মধ্যে কি কোন জলপথ ছিলো? আর যাতায়াতের কাজে মানুষ তা ব্যবহার করে চলতো?

হ্যাঁ, পুরোপুরি সে রকম কোন ব্যবস্থা বা জলপথ না থাকলেও কাজের মত কিছু ছিলো বৈকি।

ব্যাপারটা কি রকম?

চমৎকার প্রশ্ন। এবার সেটাই একটু দেখা যাক ইতিহাসের পাতা হাতড়ে।

কলকাতার কাছে হুগলী নদীর মতই উত্তর-পূবে ছিলো আরও একটা নদী। তার নাম কি জানো ? বিদ্যাধরী নদী। দুঃখের কথা, সে নদী বেশ কয়েক বছর আগেই একেবারে শুকিয়ে গেছে।

বিদ্যাধরী নদী ছাড়াও, ইংরেজরা যখন এই শহরে প্রথম আসে তখন চাঁদপাল ঘাটের কাছ থেকেই হুগলী নদীর একটা খাল হেস্টিংস স্ট্রীট হয়ে ধর্মতলা স্ট্রীট পেরিয়ে বয়ে চলতো। এখনকার ওয়েলিংটন স্কোয়ার পার হয়ে এগিয়ে চলতে চলতে গিয়ে সেটা পড়েছিলো একেবারে আজকের লবণ হ্রদ বা সল্ট লেকে। এই খাল মাল পরিবহন আর যাতায়াতেও বেশ সাহায্য করে চলতো।

এ খাল কবে বুঁজিয়ে ফেলা হয়েছিলো জানো ? সেই ১৮০০ সালের কিছু পরে। আর তা করা হয় কলকাতায় মাটির নিচে ড্রেনের পাইপ পাতার জন্যই।

হ্যাঁ, আরও একটা খাল বা নালাও যে কলকাতায় ছিলো—ছিলো কেন আজও তা কলকাতার বুকে রয়ে গেছে।

কোন খালের কথা বলতে চাই বুঝতে পেরেছো ?

হ্যাঁ, সে খাল হলো আজকেরও সেই টালির নালা বা আদি গঙ্গা। এই আদি গঙ্গা বা টালির নালায় চলতো নৌকোয় যাতায়াত আর পরিবহন।

টালির নালা বা আদি গঙ্গা কিন্তু এককালে প্রায় শুকিয়ে এসেছিলো। একে আবার নতুন করে সংস্কার করেছিলেন বলে উইলিয়াম টলির নামেই এর নাম হয়ে যায় টলি বা টালির নালা।

আরও একটা খাল বা খাদ ঘিরে রেখেছিলো কলকাতাকে উত্তর দিক থেকে একেবারে পূবদিকে ! এর নাম ছিলো 'মারহাট্টা ডিচ' বা মারহাট্টা খাদ। এর অস্তিত্ব আজও এতো বছর পরেও চোখে পড়ে কলকাতা শহরের উত্তরে চিৎপুর আর বেলগাছিয়ায়।

মারহাট্টা খাদ কেন কাটা হয় জানো ? এটা কাটা হয়েছিলো বহু বছর আগে বর্গীর আক্রমণ ঠেকানোর উদ্দেশ্যে। তাই এর নাম মারহাট্টা খাদ। এ ছাড়াও কলকাতায় ছিলো বেলেঘাটা খাল।

জলপথের কথার শেষ পর্যায়েই আমরা কিন্তু এসে পড়েছি। এবার চলো, আমরা একটু দেখি স্থলপথে কলকাতায় যাতায়াতের কাজ কি রকম ভাবে চলতো ? তার পথই বা কেমন ছিলো ?

এবারে তাই কলকাতার রাস্তার কথা।

কলকাতা শহর আস্তে আস্তে গড়ে উঠছিলো এবার। আর গড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে একান্ত ভাবেই যা দরকার হয়ে উঠেছিলো তা হলো শহরে যাতায়াতের পথ।

আগেই বলেছি কলকাতায় তখন ছিলো কিছু কাঁচা মেঠো পথ মাত্র।

এবার কলকাতার মানুষজন বেড়ে ওঠার সঙ্গে পথঘাটের প্রয়োজনও খুব বেশি করেই বোধ করতে লাগলো সবাই।

কলকাতা আস্তে আস্তে কিন্তু হয়ে উঠেছিলো বেশ জমজমাট বাণিজ্য কেন্দ্র। এখানে ইংরেজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কুঠিয়াল আর তার সাঙ্গোপাঙ্গো ছাড়াও ছিলো বহু আর্মানী আর ওলন্দাজও।

আর এরা ছাড়া কোম্পানীর কাজের দৌলতে বাস করতে এলো এদেশীয় বহু মানুষও।

কলকাতায় এদেশীয়দের মধ্যে কারা সবচেয়ে আগে এসেছিলো জানো? শেঠ আর বসাকরা।

'বসাকদিঘী' নামের রাস্তায় এখনও বসাকদের স্মৃতি রয়ে গেছে।

কিন্তু সে কথা যাক। এবার পথ ঘাটের কথাটাই আলোচনা করা যাক। কারণ সকলের আগে তো চাই পথ, না হলে আমাদের আসল আলোচ্য বিষয় সেই কলকাতার যানবাহনের কথায় আসবো কেমন করে? সেই পাল্কি দিয়ে হয় যার শুরু।

তাহলে এবার তাকাই এসো একেবারে কলকাতা পত্তনের আদি কালের দিকে।

কলকাতার পত্তন হয় ১৬৯০ খ্রীষ্টাব্দে এটা তোমরা আগেই জেনে গেছো। তার বেশ কয়েকটা বছর পরে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী একটা কাজ করেছিলো। কাজটা হলো, তখনকার কলকাতা অর্থাৎ গোবিন্দপুর, সুতানুটী আর কলকাতা এই তিনটি গ্রামের যত জমিজমা বাড়ি ঘর আর পথঘাটের জরিপের কাজ।

তারা সে সময় কী দেখেছিলেন জরিপের মধ্য দিয়ে জানো? তারা দেখেছিলেন কলকাতা, সুতানুটী আর গোবিন্দপুরের প্রতিটি গ্রামেরই প্রায় অর্ধেকটাই একেবারে ঘোর জঙ্গল, ধানের ক্ষেত আর পতিত জমি। তিনটি গ্রামের মোটমাট প্রায় হাজার পাঁচেক বিঘে জমির প্রায় দুহাজার বিঘেই ছিলো ধানের ক্ষেত আর বনজঙ্গল। কলকাতায় তখন ওই সব ক্ষেতে নানা ধরণের চাষ আবাদও করা হতো।

কিন্তু মজার কথাও কিছু আছে।

মজার কথাটা হলো বন জঙ্গল, এঁদো পুকুর আর ধানের ক্ষেতে ভরা কলকাতার আদিকালে সেখানে পথের অস্তিত্ব যে একেবারেই ছিলোনা তা নয়।

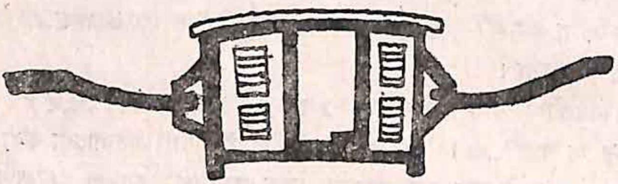
চিৎপুরে তখন ছিল দেবী চিত্তেশ্বরীর মন্দির। ধর্মতলা থেকেই মন্দিরে যাওয়ার একটা পথ ছিল যার নাম 'পিলগ্রিম রোড'। এই মন্দির নাকি তৈরি করে চিতে ডাকাত।

ওই জরিপের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছিলো প্রায় আঠারো শতকের গোড়ায়। তারই হিসেব থেকে জানা যায় কলকাতায় তখন গোটা দুই 'স্ট্রীট,

আর 'লেন'ও ছিলো। তবে রোড, বাইলেন, অ্যাভিনিউ ইত্যাদি মোটেও ছিলোনা। তবে রাস্তা যেটুকুই থাক, সবই ছিলো বেশ সরু আর কাঁচা

হ্যাঁ, রাস্তাতো দুএকটা ছিলো ঠিকই, কিন্তু যানবাহন ?

গাড়ি একটা ছিলো একথা সত্যি। কিন্তু সেটা কি ধরণের গাড়ি ? সে গাড়ি হলো পৃথিবীর সেই আদিমতম যান অর্থাৎ গরু বা মোষের গাড়ি আর অবশ্যই পালকি।



পালকি

কিন্তু গাড়ির কথায় আমরা আস্তে আস্তেই পেঁছিবো। আগে দেখা যাক কলকাতার রাস্তা কি ভাবে গড়ে উঠলো—সত্যিকার ভালো রাস্তা। কাঁচা রাস্তা ছেড়ে কলকাতা কেমন করে গড়ে তুললো যানবাহন চলাচলের উপযোগী রাস্তা।

কলকাতার, মানে তখনকার গোবিন্দপুর, সুতানুটী আর কলকাতা, এই তিনটে গ্রাম মিলিয়ে যে কলকাতার পত্তন তার জরিপের কথাটা তো আগেই বলেছি। প্রথম জরিপ হয় ১৭০৬ খ্রীষ্টাব্দে।

জরিপ কাকে বলে জানো নিশ্চয়ই ?

জরিপ হলো জমি, বাড়িঘর, রাস্তা সব কিছুরই মাপ জোকের কাজ। প্রথমবার এই জরিপের কাজ হয়ে যাওয়ার পর কলকাতায় আবার দ্বিতীয়বার জরিপ হলো ১৭২৬ খ্রীষ্টাব্দে। তারপর ১৭৪২ খ্রীষ্টাব্দে। রাস্তাঘাটও বাড়তে শুরু করেছিলো।

দ্বিতীয়বার জরিপের ফলে কি জানা গেলো ?

এ প্রশ্ন তোলা স্বাভাবিক। প্রথমবার জরিপ করার পর দ্বিতীয়বার করার মধ্যে তফাত ছিলো বিশ বছরের। এই বিশ বছরে নিশ্চয়ই কলকাতার কিছু কিছু অদল বদল আর উন্নতিও ঘটেছিলো দ্বিতীয়বার জরিপ করার পর দেখা গেলো কলকাতায় রাস্তাঘাট কিছু বেড়েছিলো। বেশ কিছু স্ট্রীট, লেন ইত্যাদি কলকাতায় তখন দেখা গিয়েছিলো।

তার মানে কি ?

মানে হলো, হ্যাঁ, কলকাতা কিছুটা এগিয়েছিলো শহর হিসেবে। মানুষের, অর্থাৎ তখনকার কলকাতার অধিবাসীদের প্রয়োজন মত রাস্তাঘাট বানানো শুরু হয়েছিলো তখন।

তারপর ?

তারপর আরও কয়েকটা বছর পার হয়ে গেলে ১৭৪২ সালে তৃতীয়বার জরিপের ব্যবস্থা করলেন তখনকার কলকাতা শহরের কর্তাব্যক্তিরা—অর্থাৎ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সাহেবরা।

তখন কি রকম ব্যাপার স্যাপার চোখে পড়লো ? কলকাতা কি কলকাতা হতে শুরু করেছিলো ?

একটা ব্যাপার নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছো সকলে—সেটা হলো, মোট পনেরো থেকে বিশ বছর পরে পরেই ওই জরিপের কাজটা হাতে নেওয়া হয়।

আসলে সে যুগের কথাটাও একটু ভাবতে হবে বৈকি। সেটাতো আজকের এই অতি আধুনিক কোন যুগ ছিলোনা, তাই জরিপের কাজেও নানা সমস্যা এড়িয়ে যাওয়া কঠিনই ছিলো। তবুও সে যুগের মানুষকে ধন্যবাদ জানাতেই হয় কারণ তারা নানা অসুবিধার মধ্যেও কাজটা চমৎকার ভাবেই করেছিলেন। আর আরও আনন্দের কথা, এসবের নথিপত্রও পাওয়া গেছে। তাই সবই জানাও সম্ভব হতে পেরেছে।

কিন্তু সেকথা থাক। এবার দেখি এসো তৃতীয়বারের জরিপে কী কী তথ্য পাওয়া গিয়েছিলো।

১৭৪২ সালের জরিপ হলে দেখা গেলো কলকাতা শহরের সেই 'স্ট্রীট' নামে যে সব রাস্তা ছিলো তার সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছিলো প্রায় কুড়ির কাছাকাছি। 'লেন' আর আরও ছোট রাস্তা 'বাইলেন'ও বেশ বেড়ে গেছে। এদের সংখ্যা প্রায় পঞ্চাশ পেরিয়ে গেছে।

ব্যাপারটা নিশ্চয়ই কি রকম বুঝতে পারছো ?

কলকাতা হাঁটি হাঁটি পা পা করে এগিয়ে চলতে শুরু করেছিলো। রাস্তার সংখ্যার বৃদ্ধিই তার প্রমাণ। তার মানে শহরবাসীদের প্রয়োজন বাড়তে শুরু করেছিলো—বাড়তে শুরু করেছিলো তাদের নানা এলাকায় পৌঁছবার তাগিদ।

আর এর সঙ্গে আরও একটা কথা।

কথাটা হলো, সে প্রয়োজন কিন্তু শুধু সেই ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর লোকজনের নয়।

হ্যাঁ, ঠিক ধরেছো, প্রয়োজনটা ছিলো কলকাতায় যারা বাস করতে এসেছিলো সেই সব প্রথম যুগের অধিবাসীদেরও।

হ্যাঁ, কলকাতার জনসংখ্যা বাড়তে শুরু করেছিলো। সেই বোধ হয় শুরু—তারপর ? তারপর, একটু আজকের কলকাতার সঙ্গেই মিলিয়ে নিলে দোষ কি ?

দিন এগিয়ে চলেছিলো। কলকাতা একটু একটু করে পূর্ণতার রূপও পেয়ে বসেছিলো। সেকালের এঁদো পচা ডোবা, পুকুর ভরাট করাও

শুরু হয়েছিলো। হয়েছিলো কাঁচা রাস্তার বদলে ভালো পাকা রাস্তা তৈরির কাজ।

ক্রমে ১৭৫৬ সন এসে গেলো। কিন্তু আসল বড় মাপের কোন লম্বা পথ বা রাস্তা তখনও কিন্তু তৈরি হয়নি কলকাতায়।

এই ১৭৫৬ সালের জুন মাসে কলকাতায় সাংঘাতিক কান্ড হলো। নবাব সিরাজদ্দৌলা কতকাতা আক্রমণ করে বসলেন। এ শহর জয় করে নাম বদলে রাখলেন আলি নগর। অবশ্য সে অন্য গলপ।

আগের ওই স্ট্রীটই হোক বা লেন, বাইলেনই হোক, সব রাস্তাই ছিলো একেবারে সরু আর কাঁচা রাস্তাই। যানবাহনের দেখা তেমন মিলতো না।

এ থেকে একটা ব্যাপার নিশ্চয়ই তোমরা আন্দাজ করতে পারছো। সেটা হলো, কলকাতা শহর হয়ে উঠতে লাগলেও কিন্তু যানবাহনের তেমন দেখা সেখানে মেলেনি। গোড়ার দিকের সেই গাড়ি—অর্থাৎ ঘোড়ার গাড়ি জাতীয় কিছুর তো নয়ই। ওরকম রাস্তায় তো ঘোড়ার গাড়ি চলার কোন রকম প্রশ্নই ছিলোনা।

ঘোড়ার গাড়ির কথাটা উঠলো কেন ?

ঘোড়ার গাড়ির কথা ওঠার কারণ হলো সে সময় পৃথিবীর বহু জায়গার শহরে এর প্রচলন ছিলো। আর সাহেবদের নিজেদের দেশেতো বটেই।

কলকাতা শহরটায় এই আঠারো শতকের মাঝামাঝি মোটামুটি চলাফেরার জন্য শহরবাসীদের নির্ভর করতে হতো নিজের পা দুটোর উপরেই। আর না হয় গোরু বা মোষের গাড়ি বা পালকির উপর।

হ্যাঁ, এবার আমরা কলকাতার বুকে প্রথম যানবাহনের দেখা পেতেই চলেছি।

কিন্তু অতো দ্রুত চলতে গেলে খেই হারিয়ে ফেলবো যে। তাই আর একটু আস্তে আস্তেই চলতে থাকি। কারণ, এখনও আমরা আমাদের শহর এই কলকাতায় বড় জাতের রাস্তা গড়ে উঠতে দেখিনি। আমরা শুধু দেখেছি স্ট্রীট, লেন আর বড় জোর বাইলেনই।

একটা কাজ তখনকার কলকাতা শহরের কর্তাব্যক্তিরা করেছিলেন সে কথা তো আগেই বলেছি। সেই জরিপের কাজ—আর জরিপের কাজের সঙ্গে যা জড়িত থাকে সেই ম্যাপ তৈরি করে ফেলা।

১৭৫৬ সালের জরিপে একটা জিনিস খুবই পরিষ্কার হয়ে ওঠে। কলকাতা নগর হিসেবে অনেকটাই উন্নতি করেছে। শহরের বহু এলাকার জঙ্গল কেটে সাফ করে বহু পাকা বাড়িও ততদিনে তৈরি হয়েছে। ১৭৪২ সালের জরিপে যে সব জায়গাকে পতিত বলে দেখানো হয়েছিলো তাকেই দেখানো হয় বেশ ঘন বসতির এলাকা।

আরও মজার কথা, কলকাতায় ঘরবাড়ির সংখ্যা বেশ দ্রুতই কিন্তু বাড়তে

শুরু করেছিলো। ১৭৪২ সালে ২১টি বাড়ি দেখানো হয় আর ১৭৫৬তে সেটা কত হয় জানো ? একেবারে ২৬৮টা।

কলকাতা শহর বেড়ে ওঠার সময় রাস্তাঘাটের চাহিদা বাড়ছিলো তা তো আগেই বলেছি। কলকাতায় তাই লোকজনও বেড়ে উঠেছিলো। কলকাতায় লোক বসতি বাড়ার কিন্তু আর একটা কারণও ছিলো।

সেটা কি জানো ?

সেই মারহাট্টা ডিচের কথা মনে করে দেখ। ১৭৪২ সালে বর্গী বা মারাঠা দস্যুদের আক্রমণ ঠেকাতেই খাদের বেষ্টনী দিয়ে কলকাতা শহরকে বাঁচানোর চেষ্টা হয় আর কলকাতায় ইংরেজদের কেল্লা বা দুর্গ থাকায় লোকেরা নিরাপত্তা পাবে বলেই কলকাতায় ছুটে আসে। আর তারই ফলে বহু বনজঙ্গলও সাফ হয়ে যায়। আর তাতে কি হলো জানো ? কলকাতা শহরের উপকণ্ঠে হোগল কুড়িয়া, সিমলা, আরকুলি, মির্জাপুর, মলঙ্গা, তালতলা, উল্টোডাঙ্গা ছাড়াও অনেক এলাকাও কলকাতার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়।

আরও একটা কথা। কলকাতার নিরাপত্তা নির্ভর করতো কিন্তু অনেকটাই সেই ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর দুর্গ বা কেল্লা 'ফোর্ট উইলিয়ামে'র উপর।

কিন্তু আমাদের এ আলোচনা এবার থাক, চলো আবার আমরা ফিরে যাই কলকাতার রাস্তা ঘাটের প্রসঙ্গে।

কলকাতায় যে স্ট্রীট, লেন আর বাই লেন গড়ে উঠেছিলো একথা আমরা গত কয়েকটা জরিপের মধ্য দিয়েই দেখতে পেয়েছি। এবার চলো দেখা যাক কলকাতা শহরটায় প্রথম বড় আকারের রাস্তা কবে প্রথম তৈরি হলো আর সেটাই বা কোন রাস্তা।

কলকাতার প্রথম বড় রাস্তা হলো আমাদের আজকের একান্ত পরিচিত সার্কুলার রোড। ১৭৪২ সালে যে মারহাট্টা খাল খোঁড়া হয় তারই বেশ কিছু অংশ বুজিয়ে ফেলেই তৈরি হলো সার্কুলার রোড। সার্কুলার রোড কবে নাগাদ তৈরি হয় ? অনেকের মতেই ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি।

কিন্তু এই বড় রাস্তা অর্থাৎ সার্কুলার রোড প্রথমেই কি পাকা রাস্তাই ছিলো ? হ্যাঁ, এরকম প্রশ্ন করা তো একান্ত স্বাভাবিক।

কথাটা হলো কলকাতায় তখন পীচ বা অ্যাসফাল্টের রাস্তার কথা কেউ শোনেই নি। তা বলে পাকা রাস্তা কাকে বলতো সে যুগে ? পাকা রাস্তা হলো ইঁট আর খোয়ায় তৈরি রাস্তা। স্টোন চিপস আর পিচ দিয়ে কলকাতার রাস্তা বাঁধানো কিন্তু শুরু হয় এর ঢের ঢের পরে, বিশ শতকে।

রাস্তা তৈরি করার কাজটা কিন্তু আন্দাজে মোটেও করা হয়নি। কলকাতা শহর জরিপ করার সঙ্গে সঙ্গে রাস্তাঘাট সম্বন্ধে সব কিছু ঠিক ঠাক করার জন্য সে যুগেও নিয়োগ করা হয় পথ-সমীক্ষক। এদের নাম ছিলো রোড সার্ভেয়ার।

সার্কুলার রোড ততদিনে তৈরি হয়ে গেলো। রাস্তাটা পাকা করে তোলারও বন্দোবস্ত হলো ১৭৯৯ সালে সেই ইঁট আর খোয়া দিয়েই।

আস্তে আস্তে এবার আঠারো শতক শেষ হয়ে এসে গেলো কিন্তু উনিশ শতক। তখন গভর্ণর জেনারেল লর্ড ওয়েলেসলি। কলকাতা নিয়ে তখন ভাবনাও শুরু হয়ে গেছে। সকলেরই মনের ইচ্ছে কলকাতাকে সুন্দর করে গড়ে তোলা। ১৮০৩ সালে তাই শহর কলকাতার উন্নতি সম্বন্ধে পরামর্শ দেওয়ার জন্য গড়ে তোলা হলো এক কমিটি—নাম 'শহর উন্নয়ন কমিটি'। এতে ছিলেন কলকাতার অনেক নাগরিক।

শহরের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে ব্যবস্থা, পথঘাট, পয়ঃপ্রণালী বাজার, কবরখানা, জল সরবরাহ, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার স্থান, স্কুল, বাড়ি-ঘর সব কিছুই নিয়েই ভাবনা, আর যোগ্য ব্যবস্থা গড়ে তোলা হতে লাগলো।

উপরের সেই কমিটি কিন্তু এর অনেক কিছু সম্বন্ধেই সুপারিশ করেছিলেন আর সরকারও সেগুলো মেনেও নিয়েছিলেন। কিন্তু আসলে তেমন কাজের কাজ হয়নি।

এই সময় কলকাতার উন্নতির জন্য একটা ভারি মজার ব্যবস্থাও নেওয়া হয়। মজার ব্যবস্থাটা কি জানো, লটারি করে টাকা জোগাড় করা।

সেই হলো কলকাতা শহরের প্রথম লটারি।

কলকাতায় প্রথম যে বছর লটারি হলো সে হলো ১৭৮৪ সাল। লটারি করে বেশ ভালো রকম টাকাই উঠেছিলো। সে যুগে কলকাতাবাসীদের কাছে এ এক মজার আমোদই হয়ে উঠেছিলো সন্দেহ নেই। লোকের খুবই আগ্রহ জাগিয়ে তুলেছিলো ওই লটারি।

লটারির টাকায় তাহলে কলকাতা শহরের কি রকম উন্নতি হলো? হ্যাঁ, এরকম প্রশ্ন সঙ্গতভাবেই তুলতে পারো বৈকি। ১৮০৫ সাল থেকে ১৮১৭ সাল অবধি কলকাতায় বেশ কয়েকবার লটারি করা হয় আর বেশ মোটা রকম টাকাও তোলা হয়। লটারির টাকায় তৈরি হলো সেই বিখ্যাত টাউন হল আর বহু রাস্তাও।

তাহলে আবারও আমরা কিন্তু ফিরে এলাম সেই রাস্তারই কথায়। সার্কুলার রোডের মত পাকা বড় রাস্তা তো ততদিনে তৈরি হয়ে গেছে। আমরা জেনে গেছি।

অনেক বছর ইতিমধ্যে কেটে গেছে। কলকাতা পত্তনের পর একশ বছর পারও হয়ে গেছে।

১৮০৫ থেকে ১৮৪০। পঁয়ত্রিশ বছর। এই পঁয়ত্রিশ বছরে কিন্তু কলকাতা মোটেও থেমে থাকেনি। পা পা করে এগিয়ে চলেছিলো সে।

কিন্তু কলকাতার সব কিছু গড়ে ওঠার ব্যাপারে আমাদের কিন্তু মাথা ব্যথা নেই—আমরা চাই প্রধানত শহরের পথঘাট সম্বন্ধে জানতে। যাতে আমরা

এবার পেঁৗছে যেতে পারি শহর কলকাতার যানবাহনের কথায়।

সেই পঁয়ত্রিশটা বছরে কলকাতায় কি কি রাস্তা তৈরি হয়েছিলো এবার একটু জানা যাক এসো।

সে সময়ে তৈরি হয়ে গেলো, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, আমহার্স্ট স্ট্রীট, কলেজ স্ট্রীট, কলুটোলা স্ট্রীট, ওয়েলিংটন স্ট্রীট ইত্যাদি রাস্তা।

এ থেকে একটা জিনিস নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো?

ব্যাপারটা হলো কলকাতার পথঘাট নানাদিকেই কিন্তু শাখা প্রশাখা ছড়িয়ে বেড়ে উঠতে চাইছিলো। ধিকি ধিকি বেড়ে উঠছিলো কলকাতার প্রাণ-স্পন্দন।

কলকাতার লোক সংখ্যা তখন কত?

এ একটা চমৎকার প্রশ্ন।

আমরা, যারা আজ কলকাতা শহরে বাস করে অজস্র মানুষের ভিড়ে প্রায় হারিয়ে যেতেই বসেছি, তাদের কাছে শহর কলকাতা গড়ে ওঠার যুগে কত মানুষ ছিলো জানতে চাইবো বৈকি। এতো নিতান্ত স্বাভাবিক একটা জানার কথা।

আঠারো শতকের মাঝামাঝি কলকাতা যখন কলকাতা হয়ে ওঠার দিকে ক্রমে ক্রমে পা বাড়িয়ে ছিলো সে সময় কলকাতার জনসংখ্যা হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলো চোদ্দ হাজারের মত। সেটা কিন্তু সেখানে থেমে থাকেনি—ক্রমেই আরও দিনে দিনে বাড়তেই শুরু করেছিলো।

নতুন নতুন রাস্তা ঘাট যেমন এরই মধ্যে তৈরি হয়ে চলেছিলো তেমনি আবার আরও একটা কাজও হাতে নেওয়া হয়। সেটা হলো, কিছু কিছু রাস্তাকে আবার ভেঙে নতুন করে তৈরি করা হলো বা চওড়া আর একেবারে সোজাসুজি করে তোলাও হলো। কলকাতার গড়ের মাঠের মধ্য দিয়েও বানানো হলো পায়ে চলার পথ আর গাড়ি চলারও উপযোগী রাস্তা।

যে সব রাস্তা চওড়া করে তোলা হলো তার মধ্যে কোন কোন রাস্তা ছিলো জানো? ফ্রি স্কুল স্ট্রীট, কিড স্ট্রীট, ম্যাঙ্গো লেন, বেণ্টিঙ্ক স্ট্রীট—এইসব বিখ্যাত রাস্তা। এগুলো সবই অতি পুরনো রাস্তাই ছিলো কলকাতার। আর ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী যখন কলকাতার প্রায় মালিক তাই রাস্তাঘাটের নামকরণ বেশির ভাগই করা হয় সাহেবসুবোদের নামেই, শুধু দু-একটা ছাড়া —যেমন কলুটোলা স্ট্রীট, ক্যানাল স্ট্রীট। কলুটোলায় কলুদের বাস তাই বোধ হয় এরকম নামকরণ আর ক্যানাল স্ট্রীট খালের ধারে রাস্তা বলেই। আবার কলেজ স্ট্রীট কলেজ পাড়া বলেই। আর এক রাস্তার নাম ফ্যান্সী লেন। এখানে ফাঁসি দেওয়া হত। পরে ফাঁসি থেকে দাঁড়াল ফ্যান্সী।

কলকাতার বয়স কিন্তু বেড়ে চলেছিলো এতোসব কাণ্ড কারখানা, রাস্তাঘাট, এইসব তৈরি হওয়ার ফাঁকে। ক্রমে এসে গিয়েছিলো উনিবংশ শতাব্দী।

কলকাতার পথ ঘাটের উন্নতির জন্য বেশ কিছু কমিটিও তৈরি হয়ে গিয়েছিলো। নানা নিয়ম কানুনও তৈরি হয়েছিলো রাস্তা কেমন হবে সেটা ঠিক করতেই।

এরপর আর কি কি রাস্তা বানানো হলো?

সে কথাতেই চলো পেঁছে যাই। ১৮৪৮ সালের এক আইনে বলা হলো কলকাতার যত সরু গলি ঘুঁজি খুঁজে বের করে সোজা আর বড় চওড়া রাস্তাই বানানো হবে। গাড়ি চলার পথ হবে পঞ্চাশ ফুট চওড়া আর যে রাস্তায় গাড়ি চলার সুবিধা দরকার নেই তা হবে বিশ ফুটের মত।

এরপর তৈরি হলো ক্যানিং স্ট্রীট, গ্রে স্ট্রীট, বিডন স্ট্রীট এই তিন রাস্তা। কিন্তু সে কালের কলকাতায় রাস্তার মোটমাট দৈর্ঘ্য কি রকম ছিলো? হ্যাঁ, একথাটাও জেনে নিলে মন্দ হয় না।

১৮৬৬ সালে হল প্রথম জনগণনা বা সেনসাস। তখনকার জনসংখ্যা দেখা যায় প্রায় সাড়ে তিন লাখ। আর পথের সংখ্যা প্রায় পাঁচশ।

একেবারে ১৮৯০ সনে চলো হাজির হই। ওই সময়ে কলকাতা শহরে রাস্তাঘাটের মোটামুটি দৈর্ঘ্য ছিলো প্রায় ১৮০ মাইলের মতই। তার মধ্যে সরু গলি প্রায় পঁয়ত্রিশ মাইল।

কলকাতা শহরের এলাকা আর চৌহদ্দীও বাড়ছিলো। কলকাতার আশে পাশের বহু এলাকা আর শহরতলীও এবার ঢুকিয়ে নেওয়া হলো কলকাতার মধ্যে। এর মধ্যে ছিলো বালিগঞ্জ, ভবানীপুর, কালীঘাট, আলিপুর এই সব এলাকা।

তারপর তৈরি হলো আরও রাস্তা ঘাট। যেমন ঃ হাজরা রোড, ল্যান্সডাউন রোড, হরিশ মুখার্জী রোড এই রকম সব রাস্তা।

পথঘাটের ইতিহাসের প্রায় শেষ পর্যায়েই আমরা এবারে পেঁছে গেছি বলতে পারো, কলকাতা শহর তখন মোটামুটি এক বড় মাপেরই শহর হয়ে উঠেছে। শহরের উন্নতির জন্য তখন থেকেই নেওয়া হচ্ছে নানা রকমের ব্যবস্থা। এরই উদ্দেশ্যে ১৯১১ সালে কলকাতা ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাস্ট নামে এক সংস্থাও তৈরী হলো। তারা বহু ভালো ভালো পথ ঘাট তৈরি করে সুন্দর করে তুললো কলকাতাকে।

তারা বানিয়েছিলো কোন কোন রাস্তা জানো?

শোনো তবে—আজকের বিখ্যাত সেণ্ট্রাল অ্যাভিনিউ বা চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ, কলকাতার সবচেয়ে নামী আর দামী রাজপথ। এ ছাড়াও, রসা রোড, রাসবিহারী অ্যাভিনিউ, যতীন্দ্রমোহন অ্যাভিনিউ, এই সব বিখ্যাত রাস্তা।

ইতিমধ্যে কিন্তু বিশ শতকের কুড়ির দশকে পিচ আর অ্যাসফাল্ট মেশানো পথ তৈরী হতে শুরু হয়।

কলকাতার পথ ঘাটের গড়ে ওঠার ইতিহাস এতক্ষণে আমরা কিন্তু মোটামুটি জেনে নিয়েছি।

তাহলে আর কি জানা বাকি ?

হ্যাঁ, যানবাহনের কথা। তাহলে এতক্ষণ যা বললাম তা কি ধান ভানতে শিবের গীত নাকি ?

মোটেও তা নয়। পথ ঘাটের কথা না জানলে যানবাহনের বিবর্তনের কথায় আসবো কি করে ? একটা অন্যের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবেই জড়িত, তাই না ?

কলকাতা শহরকে আমরা চমৎকার সব পথঘাটে মুড়ে দিয়েছি। আমাদের কর্তব্য শেষ। এবার অনায়াসেই আমরা চলে যেতে পারি তার যানবাহনের কথায়।

হ্যাঁ, সেই পালকিতে যার শুরু।

● তিন ●

চলো পালকি চড়ি

কলকাতার পথঘাটের গোলক ধাঁধাঁ পার হয়ে আমরা এসে পোঁছেছি এমন এক জায়গায়, যখন বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় কলকাতায় এসে গেছে নানা ধরনের যান-বাহন। চলো, পালকি চড়েই আমরা সেই পথ পরিক্রমা শুরু করি।

এখানে প্রশ্ন ওঠা তো একান্ত স্বাভাবিক যে আমরা যানবাহন নিয়ে এখনও আলোচনা করলাম না কেন ? সে আলোচনা করতে গেলে তো আবার আমাদের পিছিয়ে যেতে হবে, তাকাতে হবে পিছন পানে।

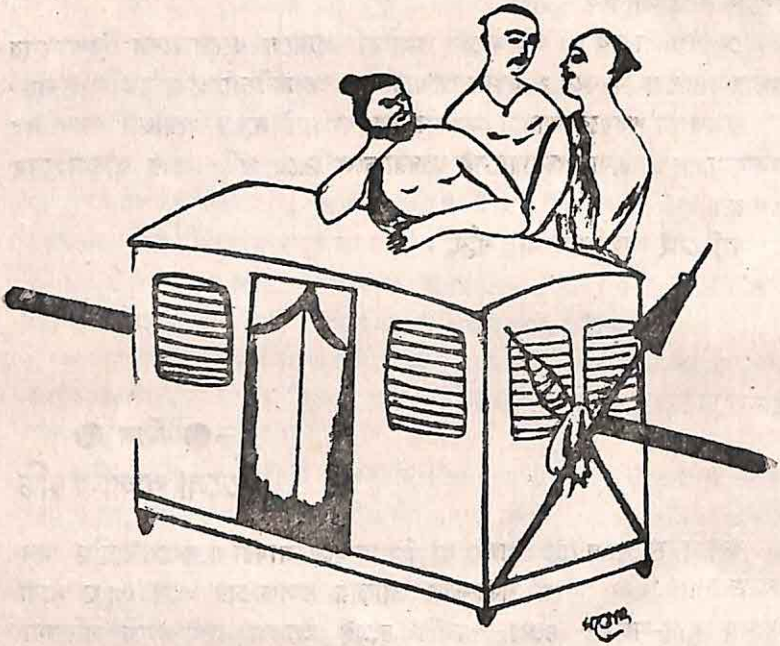
হ্যাঁ, সে কথা ঠিক।

আসলে আমরা যখন কলকাতার পথ ঘাট নিয়ে আলোচনা শুরু করে-ছিলাম তখনই যে মনে মনে একেবারে ঠিক করেই রেখেছিলাম, কলকাতার পথ ঘাট নিয়ে আধুনিক কাল অবধি সব কিছু দেখে নেবো। আর সেটাই আমরা দেখে নিয়েছি—কলকাতার পথ পরিক্রমা আমাদের শেষ।

আমরা এবার নিরিবিলিতে পালকি চড়েই আমাদের নতুন যাত্রা শুরু করতে পারি, তাই না ? পালকি কেন ? পালকি এই কারণেই যে. পালকিই হলো শহর কলকাতার আদিমতম যান এবার তাই আমাদের মূল আলোচনার বিষয় বস্তুই হবে পালকি। তারপর আমরা এগিয়ে যাবো আরও আগে —নতুন কালের নতুন যানবাহনের যুগে।

এ কাজ করতে গেলে সেই একটা কাজই আমাদের করতে হবে।

কাজটা কি নিশ্চয়ই বুঝেছো? ইতিহাসের পাতা উল্টে আমাদের চলে যেতে হবে পুরনো কলকাতার সেই দিনগুলোতে যখন বেহারারা গান গেয়ে বয়ে নিয়ে চলতো পাল্কি।



পাল্কি ও বেহারা

তাহলে তাই চলে যাই।

আমাদের দেশে পাল্কি এসেছিলো কবে সে কথা কিন্তু কারও আজ ঠিক ঠিক মনে থাকার কথা নয়। বহু বহুকাল আগেই পাল্কিই হয়ে উঠেছিলো ভারতবর্ষ আর আমাদের বাঙলাদেশের যানবাহনের একটি। অন্য যে যান-বাহন ছিলো তা হলো পাল্কির মতই ডুলি আর গরু বা মোষের গাড়ি।

ডুলি বা পাল্কিতে কিন্তু একসঙ্গে একজনের বেশি মানুষ বয়ে নিয়ে চলা সম্ভব হতো না। কারণ কি জানো? এ তো যান্ত্রিক শকট নয়—মানুষকেই তো পরিশ্রম করে এ গুলো বইতে হতো। পাল্কি আর ডুলি যারা বইতো তাদের বলা হতো বেহারা।

পাল্কি তোমরা কেউ কেউ হয়তো দেখেও থাকবে, তবে অনেকেই হয়তো তা দেখেনি। তবে ছবিতে দেখেছো নিশ্চয়ই। আজও কোন দূর গ্রামে ক্বচিৎ কখনও সখনও চোখে পড়ে এই পাল্কি। আধুনিক যান্ত্রিক শকট অতীতের সেই যান পাল্কিকে বেঁচে থাকতে দেয়নি। স্বাভাবিক নিয়মেই

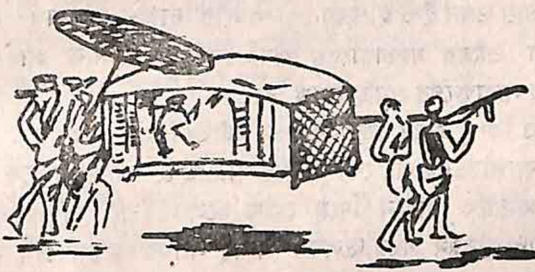
তাই পালকি একদিন স্থান নিয়েছে যাদুঘরেই।

পালকি বয়ে নিয়ে যাওয়ার মধ্যে কেমন সুন্দর একটা ছন্দই যেন খুঁজে পাওয়া যেতো। বেহারারা পালকি বয়ে চলার ফাঁকে বিশেষ ধরনের একটা গানও গেয়ে চলতো। কেন আন্দাজ করতে পারো?

হ্যাঁ,, সেটা ওরা করতে চাইতো পরিশ্রম লাঘব করার জন্যই।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতা তোমরা সকলেই নিশ্চয় পড়েছো, তাই না? সত্যেন্দ্রনাথ ছিলেন ছন্দের রাজা। তার সেই কবিতা ঃ

'পালকি চলে
পালকি চলে
গগন তলে…'



যাত্রী ও পালকি কাঁধে বেহারা

সুন্দর ছন্দে লেখা এই কবিতার মধ্যে পালকি চলার চমৎকার ছবিটাই যেন চোখের সামনে ফুটে ওঠে। এই পালকি বয়ে চলার উপরে সরোজিনী নাইডুও লিখে গেছেন এক কবিতা। অবশ্য ইংরাজীতে। অপূর্ব সে কবিতাটিও।

এবার কলকাতা শহরে পালকি করে এসেছিলো আর কবেই বা তা অতীতের বুকে মিলিয়ে গেলো সে কথাই দেখে নিই এসো।

পালকি কবে কলকাতায় এসেছিলো সে কথা কোথাও পাওয়া যায়নি। কলকাতা পত্তনের ঢের আগেও কলকাতা, গোবিন্দপুর আর সেই সুতানুটী গ্রামে পালকিই ছিলো সকলের চলার বাহন। ১৬৯০ সালে জোব চার্নক কলকাতা পত্তন করলেও গ্রাম হিসেবে দুটি যে আগেও ছিলো তা আমরা তো আগেই দেখেছি। আর পালকিও তাই আগে থেকেই ছিলো—পরে বসতি বিস্তারের সঙ্গে শুধু তা সংখ্যাতেই বাড়ে। আর তা প্রয়োজনেরই তাগিদে কারণ অন্য কোন যান তো ছিলো না।

কলকাতায় অবশ্য ওই ডুলির কথা শোনা যায় নি। কলকাতায় ছিলো গোড়া থেকেই পালকি। আসলে কি জানো, তখনকার দিনে ওই পালকির মধ্যে লুকিয়ে থাকতো আভিজাত্যেরও ছাপ। নামী, দামী লোকেরাও সবাই

ব্যবহার করতেন পালকি—কেউ ভাড়া করে আবার কেউ বা নিজের পালকিই। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সাহেব সুবোরাও ব্যবহার করতেন পালকি। আর এদেশের মানুষ তো বটেই। ডুলির চেয়ে পালকিতে বেহারা একটু সংখ্যায় বেশি লাগতো, তাই খরচও সামান্য বেশিই পড়তো।

আঠারো শতকের গোড়া থেকেই পালকির ব্যবহার বাড়তে থাকে। কেন নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছো ?

ঠিকই আন্দাজ করেছো। লোকসংখ্যা যে বেড়ে চলেছিলো। বেড়ে চলেছিল কলকাতার ব্যবসাবাণিজ্য আর বিভিন্ন এলাকায় যাতায়াতের প্রয়োজন। পয়সাওয়ালা মানুষের একমাত্র বাহনই ছিলো এই পালকি। তাই পালকির সংখ্যাও দিনে দিনে বেড়েই চলেছিলো।

কলকাতায় তখন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর দারুণ রমরমা। কোম্পানীর কর্তাব্যক্তিরা তাদের যাতায়াতের জন্য নিজেরা পালকি আর বেহারাদের মাইনে দিয়ে সারাক্ষণের জন্যই রেখে দিতেন।

এখানেও কিন্তু একটা মজার ব্যাপার ঘটতো।

মজার ব্যাপারটা হলো, কোম্পানীর যাঁরা উঁচু সারির মানুষ তারা এই পালকি বেহারাকে মাইনে দিয়ে রেখে দিলেও নিচু সারির কর্মচারিদের জন্য আলাদা নিয়ম করেছিলেন। নিচু সারির কর্মচারিদের এই পালকি আর বেহারা রাখা বারণ ছিলো। আর এটা খরচের জন্য বলা হলেও কিন্তু অন্য একটা ব্যাপারও জড়িয়ে ছিলো। সেটা হলো মর্যাদা আর সম্ভ্রমের ব্যাপার। ব্যাপারটা হলো যারা নিজের পয়সায় পালকি বেহারা রাখতে পারতেন তাদের মর্যাদা হয়ে উঠতো বেশি। পালকি রাখার মধ্যে তাই আভিজাত্যের স্পর্শ ছিলো।

আজকের মানুষ আমরা তো একথা ভাবতেই পারি না, তাই না ? আজ কারও তিন চারখানা মোটর গাড়ি থাকাও আশ্চর্যের কথা নয়। এ যেন অতি স্বাভাবিক কোন ব্যাপার। সে যুগে নিজের একখানা পালকির মধ্যেই লুকনো থাকতো সামাজিক মর্যাদার প্রশ্ন।

কোম্পানীর বড় দরের কর্তাব্যক্তিরা কিন্তু বারণ করে দিতে চাইলেও সকলেই কিন্তু ওই পালকি আর বেহারা রাখতেন—সেটাই হয়ে দাঁড়িয়েছিলো সেকালের প্রচলিত রেওয়াজ। এদেশীয় মানুষেরাও পালকি চড়তেন আর নিজেরাও তা রাখতেন।

এবার একটা কথা।

কথাটা হলো, এই পালকি বইবার কাজে কারা আসতো। ঠিক প্রশ্ন। একাজ কারা গোড়ায় করতো জানো ? বাঙালি বাগদি জাতের মানুষেরাই। কিন্তু পরে আস্তে আস্তে ভারতের অন্যান্য এলাকার মানুষও কলকাতায় ভিড় করতে আরম্ভ করে আর তারাই পালকি বাহকের কাজ করতে থাকে। এদের

মধ্যে ছিলো উড়িষ্যা বা বিহারের মানুষ।

আঠারো শতক এগিয়ে চলার অবসরে কলকাতায় পালকির সংখ্যাও বেশ বেড়ে গেলো। বেশ কয়েক শ' পালকির দেখা মিলতো কলকাতা শহরে। এর বেশ কিছু নিজস্ব ব্যক্তিগত মালিকানার আর কিছু ভাড়ার।

বিশেষ বিশেষ জায়গায় পালকি ভাড়ার জন্য রাখা থাকতো। মানুষ ইচ্ছে মত দূরত্ব অনুযায়ী তাদের ভাড়াও করতো। ভাড়া কি রকম ছিলো? হ্যাঁ, ভাড়ার কথাটাও একটু দেখা যেতে পারে।

ভাড়ার ব্যাপারটা কেমন ছিলো দেখ।

পালকির ভাড়া হতো মাইলের হিসেবে। আজকের হিসেব মত তখনকার ভাড়া ঠিক ছিলো প্রতি মাইল প্রায় বিশ পয়সা বা তখনকার তিন আনার মত। আর দিন হিসেবে, একটা পুরো দিনের জন্য দেড় টাকার মত।

এতো গেলো সাধারণ ভাড়া করা পালকির ভাড়ার হার। মাইনে করা বেহারাদের অবস্থা কেমন ছিলো সেটাও দেখে নিই এসো এবার।

তখনকার পালকি বেহারাদের মাস মাইনেও মোটামুটি বেঁধে দেওয়া ছিলো। সেটা হতো মাসে ৪ টাকা থেকে ৫ টাকার মতই।

তোমরা হয়তো ভাবতে পারো মাত্র ৪ কি ৫ টাকা? কিন্তু তখনকার অবস্থা বিবেচনায় টাকাটা নেহাত কম ছিলোনাই বলা যায়। একখানা পালকি বইতে কজন বেহারা লাগতো?

হ্যাঁ, এটাও জানা দরকার। এক একখানা পালকি বইতে মোটামুটি লাগতো ৫ কি ৬ জন বেহারা। যারা নিজের খরচে পালকি রাখতেন তাদের মাসে লাগতো প্রায় পঁচিশ টাকার মতই। আজকের ধারণায় পঁচিশ টাকায় একখানা গাড়ি। হাসবার কিছু নেই। সত্যিই তো পালকিও যে সে যুগের গাড়িই, কি বলো?

এবার দেখি এসো, পালকি দেখতে কি রকম হতো বা সেটা তৈরি করতে কি রকমই বা খরচ পড়তো।

ভাড়া করা পালকি আর নিজের পালকির মধ্যে বেশ একটু তফাৎ থাকতো। নিজস্ব পালকি স্বভাবতই একটু খরচ করে তৈরি করানো হতো বলেই খরচ একটু বেশি পড়তো। এ পালকি হতো বেশ বাহারি আর মোটামুটি আরামদায়ক যাতে চলার পথে ঝাঁকুনি কম লাগে। ভাড়ার পালকি একটু কম বাহারি হতো। পালকির তলা বানানো হতো বেতের সাহায্যে, বাকিটা কাঠের। বাহারি পালকিতে থাকতো নানা রকম নকশা। ভিতরে পাতা থাকতো গদি আর পাশে রাখা হতো আরামের জন্য তাকিয়া। চামড়া দিয়ে মোড়ার ব্যবস্থাও থাকতো কোন কোন পালকিতে। দুপাশে লাগানো ডাঁটি বা ডান্ডা কাঁধে নিয়ে চলতো বেহারারা।

বড় মানী মানুষ বা রাজা মহারাজারা আরও বাহারি ঝালর দেওয়া

পালকি ব্যবহার করতেন। কলকাতা শহরের নামী বড় মানুষদের জন্য যে পালকি বানানো হতো তার জন্য খরচ পড়তো প্রায় দুহাজার থেকে তিন হাজার পর্যন্তও। এর চেয়ে বেশি দামেরও পালকি ছিলো। কোন কোন পালকিতে দরজাও থাকতো।

আর সাধারণ ভাড়ার পালকি তৈরি করতে খরচ অবশ্যই ঢের কম পড়তো। তাতে এত আরামের ব্যবস্থা থাকতো না বলেই। পালকির আকারও ছোট বড় হতো কখনও কখনও। এর নির্দিষ্ট কোন মাপ ছিলোনা। এই পালকি চড়েই শহর কলকাতার মানুষ এপাড়া থেকে ওপাড়ায় কাজে কর্মে যাতায়াত করতো। আরও এক রকম পালকিও ছিলো—যার নাম তাঞ্জাম। এ ছিলো চেয়ারের মত খোলা পালকি।

মজার ব্যাপার স্যাপারও এই পালকির মধ্যে ছিলো। পালকির এরকম জাকজমক আর রমরমা থাকায় পালকি তৈরি আর তাকে চিত্রিত করার ব্যবসাও বেশ জমে উঠেছিলো। যে কাজে দেশী মানুষদের সঙ্গে আবার পাল্লা দিচ্ছিলো বিদেশী শিল্পীরাও। ইংল্যান্ডের বেশ কিছু নামী শিল্পী পালকিতে ছবি এঁকে পয়সা রোজগার করতো।

কোন কোন পালকিতে সোনা রুপোর কাজও থাকতো। তবে সে সব রাজা মহারাজাদের ব্যাপার। ভেলভেট বা মখমলের কাজও থাকতো। লর্ড কর্ণওয়ালিশ মহীশূরের রাজার জন্য বানিয়েছিলেন ছয় সাত হাজার টাকা দামের দারুণ সুন্দর পালকি। স্টুয়ার্ট নামে এক সাহেব তাঞ্জোরের রাজ-কুমারদের জন্য যে পালকি বানান তার দাম কম করেও হবে ১০০০০ টাকা। এই পালকির নাম ছিলো 'মিয়ানা' পালকি। পালকির ভিতর বিছানা বালিশও থাকতো আরামে যাতে শুতে পারা যায়। দারুণ বিলাসিতার ব্যাপার এই সব পালকি। এ ছিলো বাংলাদেশের শিল্প।



বিলাশ বহুল পালকি

দৃশ্যটা একটু মনে মনে কল্পনা করে নাও এবার। আর মিলিয়ে নাও আজকের যানবাহনের ভিড়ে উপচে পড়া কলকাতা শহরের সঙ্গে। ভেবে

নাও, আজকের চৌরঙ্গী বরাবর এগিয়ে চলেছে পালকি—আর তার ক্লান্ত ঘর্মাক্ত বেহারারা ছন্দের তালে তালে 'হুম হুনা…হুম হুনা' বলে চলেছে।

কথায় কথায় পালকি চড়ে আমরা কিন্তু এগিয়ে এসেছি। সেই সপ্তদশ শতাব্দী ছেড়ে এবার পৌঁছেছি উনিশ শতকের প্রায় শেষেরই দিকে।

কলকাতা শহরে কিন্তু তখনও জাঁকিয়ে রয়েছে পালকি। যদিও ততদিনে কিন্তু প্রচলন হয়ে গিয়েছে ঘোড়ার গাড়ির। ঘোড়ার গাড়ি কিন্তু পালকিকে হঠিয়ে দিতে পারেনি।

উনিশ শতকের শেষ দিকে কলকাতায় পালকির সংখ্যা কত ছিলো জানো? ১৮৯০ সালের কাছাকাছি সে সংখ্যা পৌঁছে ছিলো ৬০০ তে। আর বেহারাদের সংখ্যা প্রায় হাজার দেড়েক।

এর সঙ্গে একটা আশ্চর্য কথাই বলছি এবার।

এই পালকির বেহারারা একবার ধর্মঘটও করে বসলো। বুঝতে পারছো নিশ্চয়ই কেন? সেটা ঘটে ছিলো ১৮২৭ সালে। ধর্মঘটের কারণ রেট বাড়ানোর দাবী। হ্যাঁ, রেট বাড়ানোও হয়েছিলো।

যানবাহনের দিক থেকে সাধারণ মানুষের একমাত্র সহায় ছিলো সনাতন সেই পালকি এতো আগেই দেখেছো। উনিশ শতকের শেষ দিকে তো আমরা দেখেছি কলকাতায় ঘোড়ার গাড়ি এসে গিয়েছিলো—কিন্তু পালকির দিন তাহলেও শেষ হয়ে যায়নি। এর মধ্যে বেশ একটু দুঃখের কথাও আছে—সেই দুঃখের কথাটা হলো, ঘোড়ার চেয়েও মানুষের দাম গিয়েছিলো অনেক কমে। যে কোন পালকি বেহারার মজুরি এক ঘণ্টা হিসেবে বা সারাদিনে ঘোড়া ভাড়ার চেয়ে ঢের কম ছিলো। পালকি বেহারার মজুরি সারা দিনের জন্য ছিলো মাত্র চার আনা—অথচ ঘোড়ার ভাড়া ৫ টাকা। ভাবো, মানুষের দাম কত কম। কিন্তু ঘোড়ার কথা থাক—সে কথায় পরে আসবো আমরা।



বেহারারা ভাড়ার জন্য তৈরি

পালকির এই ইতিহাসের মধ্যে নানা রকম মজার কাহিনীও কিন্তু ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়ে গেছে। সেগুলোই এবার একটু দেখে নিই, এসো।

সে যুগের সাহেবসুবো আর এদেশীয় মানুষরাও পালকি চড়তেন এতো আগেই দেখেছো তোমরা। তাদের মধ্যে সে কালের বহু প্রাতঃস্মরণীয় বিখ্যাত

মানুষও ছিলেন। উঁচু পদমর্যাদার অনেক ইংরেজ কর্মচারি আবার দেশীয় মানুষদের সহ্য করতে পারতেন না, তা সেই দেশীয় মানুষটি যত মানী ব্যক্তিই হোন না কেন। সে কালে বহু ইংরেজ ঘোড়ায় চড়ে পথ দিয়ে যাওয়ার সময় কোন দেশীয় বড় মানুষের তার পাশ দিয়ে পালকি চড়ে যাওয়ার উপায় ছিলোনা। তাকে পালকি ছেড়ে নেমে দাঁড়াতে হতো।

এই ভাবে একদিন একজন বড় মাপের ইংরেজ রাজকর্মচারি ঘোড়ায় চড়ে পথ দিয়ে চলেছিলেন, আর ঠিক তখনই প্রাতঃস্মরণীয় রাজা রামমোহন রায় চলেছিলেন পালকি চড়ে। সাহেবকে গ্রাহ্য করলেন না রামমোহন, পথে পালকি ছেড়ে নেমে দাঁড়ানো তাঁর আত্মমর্যাদায় বেধেছিলো। সাহেব তো ক্ষেপে আগুন। তিনি রামমোহনের বিরুদ্ধে অভিযোগ করলেন। রামমোহনও ছাড়বার মানুষ নন—তিনিও দাবী জানালেন ওই অবমাননাকর নিয়ম বাতিল করা হোক।

শেষ পর্যন্ত কি হলো জানো ?

তেজস্বী রাজা রামমোহনেরই জয় হলো। ওই নিয়ম একেবারে বাতিল হয়ে গেলো।

এ ঘটনায় নিশ্চয়ই বুঝেছো রাজা রামমোহন পালকি চড়তেন। রাজা রামমোহনের মতই পালকি চড়তেন মহাত্মা ডেভিড হেয়ারও। তিনি পালকি ছেড়ে কোনদিন নাকি ঘোড়ার গাড়ি চড়তেন না। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মশাইও ভালোবাসতেন এই রকম পালকি চড়তে। সে যুগের আরও সম্ভ্রান্ত খ্যাতনামা মানুষেরাও প্রয়োজন মতই পালকি রাখতেন আর ব্যবহার করতেন। মানুষ বয়ে নেওয়া ছাড়া পালকিতে করে ডাকও বহন করা হতো—তাকে বলা হতো পালকি ডাক।

পালকির পর কলকাতায় ঘোড়ার গাড়ি এসেছিল একথা আগেই একবার বলেছি, কিন্তু তাহলেও পালকির দিন অতো চট করে শেষ হয়ে যায় নি।

ঊনিশ শতককে কি বলে তোমরা ইতিহাসের পাতায় দেখেছো নিশ্চয়ই। হ্যাঁ, তার নাম বাংলার নবজাগরণের যুগ। ইংরাজী শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে বাংলা যেন জেগে উঠেছিলো। পালকি কিন্তু সেই নবজাগরণের যুগে ছিলো যোগাযোগ ব্যবস্থার অন্যতম একটা উপায়। যাঁরা সে যুগে সেই পালকি চড়তেন তাদের মধ্যে রাজা রামমোহন, ডেভিড হেয়ার আর বিদ্যাসাগর মশাইয় নাম তো আগেই দেখেছো।

আর কারা এঁদের মতই পালকি চড়তেন ? সেটা দেখা যাক এবার। এঁদের মধ্যে ছিলেন সে কালের বাঘা বাঘা সব মানুষ। যেমন ঃ দ্বারকানাথ ঠাকুর, হেনরি ডিরোজিও, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন, স্বামী বিবেকানন্দ, রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন, এঁদের মত সবাই। সমাজ সংস্কার, ইংরাজী শিক্ষা প্রসার, দেশসেবা—এর সব কাজেই ওই প্রাতঃস্মরণীয় মহাপুরুষেরা

পালকি চড়েই করেছেন। তাঁদের অনেকেরই নিজস্ব পালকি বা বেহারা থাকতো।

কথাটা একবার আজকের সঙ্গে মিলিয়ে নাও। আজকের আধুনিক সব গাড়ির তুলনায় এই পালকিতে নির্ভর করেই এই মহামানবরা কিভাবে দেশকে গড়ে তুলেছিলেন।

মজার মজার ব্যাপারও ঘটতো পালকি নিয়ে। সে যুগের সম্ভ্রান্ত আর বনেদী পরিবারের মহিলাদের গঙ্গাস্নান করার ইচ্ছা হলে তাদের ওই পালকি চড়িয়ে পালকি সুদ্ধই জলে ডুবিয়ে আনা হতো। তারা বাইরে এসে গঙ্গায় স্নান করতেন না। এর রেওয়াজ ছিলো না। ভারি মজার ব্যাপার, তাই না? মজার হলেও এ ঘটনাই সেকালে ঘটতো।

পালকির দিন কিন্তু এতোদিনে প্রায় শেষ হওয়ার মুখেই এসে গিয়েছিলো। কলকাতায় এসে গিয়েছিলো চাকার গাড়ি অর্থাৎ ঘোড়ার গাড়ি।

পালকির যুগ শেষ হয়ে ঘোড়ার গাড়ি তাড়াতাড়ি আসারও একটা কারণ ছিলো। সে কারণ হলো পালকি বেহারাদের কিছুটা জুলুমবাজি। তাদের নিয়ন্ত্রণ করার কোন আইন না থাকায় তারা খুশি মত ভাড়া বা মাইনে দাবী করতো। আর এই কারণে সরকারও কিছু ব্যবস্থা নিয়েছিলেন আর সঙ্গে সঙ্গে চেষ্টাও চলেছিলো ঘোড়ার গাড়ি চালু করার। পালকি বেহারারা এরপর আস্তে আস্তে কলকাতা ছেড়ে যেতেও শুরু করে।

মোটামুটি পালকির পরের যুগই হলো এই যুগের গাড়ির যুগ।

তাহলে চলো, এবার সেই যুগেই আমরা প্রবেশ করি।

● চার ●

ঘোড়ার গাড়ি এলো

সেকালের কলকাতার মানুষের কাছে যানবাহন বলতে ছিলো একমাত্র সেই পালকি তাতো এতক্ষণ আমরা দেখেছি। মোটরগাড়ি তখনও আবিষ্কার হয়নি—ভারতবর্ষ বা কলকাতা কেন পৃথিবীর কোথাও তা ছিলো না—যা অন্যান্য জায়গায় ছিলো তা হলো ঘোড়ার গাড়ি—বা ঘোড়া।

কলকাতাও তাই পিছিয়ে রইলো না।

কলকাতায় তাহলে ঘোড়ার গাড়ি এলো কবে আর কোন পথে, কেমন করে?

অতি স্বাভাবিক প্রশ্ন। এবার উত্তর কি হবে দেখা যাক, এসো।

কলকাতায় ঘোড়ার গাড়ি আনার চেষ্টা হয় একেবারে আঠারো শতকের শেষাশেষি আর উনিশ শতকের গোড়ার দিকে।

কলকাতা শহরে যেমন গোড়ার দিকটায় রাস্তাঘাট ছিলো কাঁচা আর সরু সরু, তেমনি একটু একটু করে ভালো আর চওড়া রাস্তাও বানানো আরম্ভ হয়ে গিয়েছিলো ? এরকম রাস্তায় ঘোড়ার গাড়ি চলতে অসুবিধা হওয়ার কারণ ছিলো না।

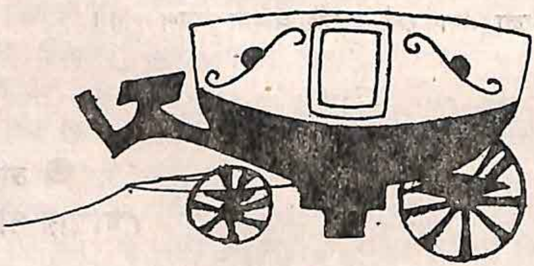
ঘোড়ার গাড়ি তাই আসলে কলকাতা শহরে আঠারো শতকের শেষ নাগাদ ঠিকই এসে গিয়েছিলো। কিন্তু সে সব ঘোড়া বা ঘোড়ার গাড়ি সাধারণের ধরা ছোঁয়ার বাইরেই থেকে গিয়েছিলো। এসব গাড়ি কলকাতায় আনা হয় সরকারি সব বড় বড় পদমর্যাদার মানুষের জন্যই। তারা কারা জানো ?

তারা ছিলেন গভর্ণর, প্রদেশের শাসনকর্তা, উচ্চপদস্থ সব আমলা আর সরকারি কর্মচারি। আর এছাড়া ওই ঘোড়ার গাড়ি চড়ে বেড়াতেন ওই সব সরকারি কর্মচারিদের পরিবারেরও লোকজন। এইসব গাড়ি চড়ে তারা গঙ্গার বা গড়ের মাঠের হাওয়া খেতেন। এসবের জন্য তাদের সহিস, কোচোয়ান ইত্যাদি বহু কর্মীও আবার রাখতে হতো।

তাহলে সাধারণ মানুষ কি করতো ?

হ্যাঁ, এ একটা প্রশ্ন বটে।

বুঝতে পারছো নিশ্চয়ই, সাধারণ মানুষের জন্য ছিলো সেই মান্ধাতার আমলের পালকিই। এ পাড়া ও পাড়া করতে বা কাজেকর্মে তাদের একমাত্র ভরসা ওই পালকিই ছিলো। যদিও তাতে খুব জরুরী কাজ তাড়াতাড়ি সেরে ফেলা কঠিনই ছিলো সন্দেহ নেই।



চেরোট

এখন দেখা যাক সাহেব-সুবোরা প্রথমেই যে দামী সব ঘোড়ার গাড়ি চড়তেন সেগুলো কি রকম ছিলো।

মোটামুটি চার পাঁচ রকম গাড়িই বড়দরের সাহেব মেমরা চড়তেন। সেগুলোই হলো কলকাতা শহরের আদি ঘোড়ার গাড়ি—যদিও সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে।

এগুলো ছিলো চেরোট, পালকি গাড়ি, বগি গাড়ি, ব্রাউন বেরি এইসব। এসবের মধ্যে কিন্তু চেরোট গাড়িই সবচেয়ে দামী গাড়ি ছিলো। এটা চড়তেন গভর্ণর, আর উচুঁ পদের সব সরকারি কর্মচারিরা।

তবে এর মধ্যে একটা কথাও মনে রাখতে হবে।

কথটা কি ?

কথাটা হলো, কোন ধরণের ঘোড়ার গাড়ি কলকাতায় সেই প্রথম যুগের দিনগুলোয় জোর কদমে ছুটেছিলো সেটা বলা একান্তই মুশকিল। কারণ এর কোন বিবরণ মেলেনি।

কিন্তু তা না হয় জানা গেলো, তাহলে সাধারণ মানুষের জন্য কবে দেখা দিলো ঘোড়ার গাড়ি ?

সে কথাই এবার আলোচনা করতে চাই।

আগেই বলেছি ঊনিশ শতকের একেবারে গোড়ার দিকে যখন পালকিই ছিলো মানুষের অগতির গতি আর বাহন, ঠিক তখনই একবার ওড়িয়া যত পালকিবাহক বা বেহারারা ধর্মঘট করে বসেছিলো। তারা প্রায়ই সব যাত্রীদের উপর জুলুমবাজী চালাতো, ইচ্ছেমত ভাড়া দাবী করতো বা মাইনে চাইতো। সাধারণ মানুষের পক্ষে তাদের দাবী না মানলেও উপায় থাকতো না। সাধারণ মানুষ অবশ্য শেষ পর্যন্ত নিদারুণ ক্ষুব্ধ হয়েই সরাসরি সরকারের কাছে আবেদন জানালো এইসব বেহারাদের জন্য কিছু আইনকানুন তৈরি করা হোক—যাতে দূরত্ব বা সময় অনুযায়ী বাহকদের বাঁধা রেট থাকে।

সরকার কথাটার গুরুত্ব বুঝলেন, আর তাই এবার একটা আইনও চালু করে দিলেন। আইন হলো বেহারারা ইচ্ছে মত রেট চাইতে পারবে না। তাদের জন্য নির্দিষ্ট রেট থাকবে আর তাদের একটা করে পরিচয় দেওয়া ব্যাজ পরতে হবে, তাতে নম্বর দেয়া থাকবে।

এবার কি হলো জানো ?

বেহারারা তো সরকারি আইন মানতে রাজি হলো না। তাদের ধারণা হলো ব্যাজ পড়লে তাদের জাত যাবে। নানা অনুরোধ, উপরোধ বা হুমকিতেও কাজ হলো না—আর বেহারারাও দল বেঁধে কাজ বন্ধ করে দিলো। তারা দল বেঁধে বর্তমানের রাসমণি অ্যাভিনিউর কাছে জমা হস। শেষ পর্যন্ত বেহারারা সটান দেশে রওয়ানা হন।

অবস্থাটা একটু আজকের সঙ্গে মিলিয়ে দেখে নাও। এখনকার প্রচন্ড গতিশীলতার যুগে ধর্মঘট হয়ে গাড়ি ঘোড়া বন্ধ হলে কেমন অবস্থা দাঁড়ায় ?

হ্যাঁ, সে যুগে লোকজন কম থাকলেও অবস্থাটা একই রকম দাঁড়ালো। মানুষের আর হাঁটা ছাড়া পথ রইলো না।

সে সময়ে কলকাতা শহরে ছিলেন এক ইংরাজ সাহেব—নাম ব্রাউনলো। সাহেব পড়ে গেলেন দারুন সমস্যায়। তার অফিস যাওয়া পালকি না থাকায় মাথায় উঠলো। কাঁহাতক আর হাঁটা যায় ? তার আবার নিজের

একখানা চমৎকার পালকিও ছিলো। কিন্তু থাকলে হবে কি—বেহারা কোথায় ?

ব্রাউনলো সাহেব এবার ভেবে ভেবে এক চমৎকার বুদ্ধি বার করে ফেললেন। আর তাতেই কলকাতা শহরের সাধারণ মানুষের যাতায়াতের দারুণ ওই সমস্যারও সমাধান হয়ে গেলো।

কেমন করে ?

হ্যাঁ, এবার সেই কথাতেই আসছি।

ব্রাউনলো সাহেবই একদিন তার পালকির দুপাশের বইবার ডাণ্ডা খুলে ফেলে তার পালকির নিচে লাগিয়ে নিলেন চারটে চাকা। আর তাতেই তৈরি হয়ে গেলো চমৎকার একখানা একঘোড়ায় টানার উপযোগী গাড়ি। সাহেবের আর সমস্যা রইলো না।

এ গাড়ির নাম কি জানো ?

ব্রাউনলো সাহেবের তৈরি বলেই এর নাম হয়ে গেলো 'ব্রাউনবেরি'। এই ব্রাউনবেরি গাড়ির জন্ম হলো ১৮২৭ সালে।

ব্রাউনবেরি গাড়ির জন্ম হতেই অনেকেরই টনক নড়লো—এরকম কিছু তো সহজেই করা যায়। না হলে যে অফিস কাছারী বন্ধ হয়ে যাবে, কারণ পালকি বেহারারা দেশে ফিরে গেছে, তারা আর পালকি বইবে না।

ব্রাউনলো সাহেবের মত আরও কেউ কেউ ওই রকম গাড়ি বানিয়ে ফেললো। কারণ কিন্তু সেই একই—পালকি বেহারাদের ধর্মঘট। ১৮২৭ সালেই তাই এই রকম কিছু গাড়ি বাজারে চালু হলো—এর একটার নাম ছ্যাকরা গাড়ি।

এই ছ্যাকরা গাড়ি হতো এক ঘোড়া বা দু ঘোড়ায় টানা লাল বা কালো রঙের তৃতীয় আর দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়ি। এই গাড়ি বাজারে চালু হতেই মানুষের আর কোন যাতায়াতের সমস্যা রইলো না।

আর কি হলো ?

এ প্রশ্নের জবাব হলো, কলকাতার সেই মানুষের উপর নির্ভরশীল একান্ত ধীরগতি পালকির বদলে কলকাতার পথে ছুটে চললো ঘোড়ার দ্রুতগতি যান।

আর ?

কলকাতা যেন এক লাফে বহুদূর এগিয়ে এলো। ঊনবিংশ শতাব্দীর সেই নবজাগরণের দিন গুলোয় ঘোড়ার গাড়ি যেন আশীর্বাদ হয়েই নেমে এসেছিলো। বাংলাদেশের ওই নবজাগরণের যুগটাকে তাই বোধ হয় অনায়াসেই বলতে পারা যায় 'ঘোড়ার গাড়ির যুগ'। কলকাতার শান্ত নিরিবিলি পথের বুকে শোনা যেতে শুরু করেছিলো ঘোড়ার ক্ষুরের খটাখট্ শব্দ। ছুটে চলতো ল্যাণ্ডোলেট বা ব্রুহাম।

কলকাতার মানুষের গতি এবার আস্তে আস্তে বেশ স্বচ্ছন্দ হয়েই উঠেছিলো কি বলো ?



ল্যাণ্ডোলেট

হ্যাঁ, কথাটা ঠিক। মানুষের একটা জটিল সমস্যার সমাধান হয়ে গিয়েছিলো। এবার দেখা যাক আর কত রকমের ঘোড়ার গাড়ি কলকাতার শহরে একে একে দেখা দেয়।

ঘোড়ার গাড়ির মধ্যে বৈচিত্র্যের সত্যিই শেষ ছিলো না। যেমন বিচিত্র সব আকার তেমনি সুন্দর নামও দেওয়া হয় গাড়িগুলোর।

এই ভাবে একে একে এসেছিলো ঃ

অফিসযান আর কেরাঞ্চি গারি। ভারি অদ্ভুত নামই। অফিসযান গাড়ি নির্দিষ্ট রাখা থাকতো সব সাহেব-সুবোদের জন্য। আর নাম শুনেই নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো কেরাঞ্চি গাড়ি ছিলো এদেশীয় কেরাণীকুলের গাড়ি। এই কেরাঞ্চি গাড়ি কলকাতায় খুবই জনপ্রিয় হয়ে ওঠে—সাধারণ লোক দল বেঁধে এতে শেয়ারে ভাড়া দিয়ে যাতায়াত করতো। বিলেতের পুরানো ভাড়াটে গাড়ির মতই এই কেরাঞ্চি গাড়িও দুটো ঘোড়ায় টানতো। অবশ্য ঘোড়াগুলো সে রকম তেজীয়ান মোটেই নয়।

কেরাঞ্চি গাড়ি কেমন ছিলো জানো ?

গাড়িগুলো ছিলো ছোট আর নিচু কাঠের খাঁচার মত দেখতে। একেবারে হাড় জিরজিরে ঘোড়া এগুলো টানতো। অনেকে আবার অফিসের পর বা ছুটির দিনে দল বেঁধে কেরাঞ্চি গাড়ি চড়ে শহরে বেড়াতেও চাইতেন। অনেকে আবার এতে চড়ে কালীঘাটের মন্দিরেও আসতো। চিৎপুর কসাই-তলা আর চৌরাঙ্গী বরাবর দক্ষিণে কালীঘাট পর্যন্ত টানা রাস্তাও তখন ছিলো। তাহলে বোঝা যাচ্ছে কেরাঞ্চি গাড়ি যে যুগে বেশ হৈ চৈ তুলে ফেলেছিলো।

কেরাঞ্চি গাড়ি, ছ্যাকরা গাড়ি আর ব্রাউনবেরি'র নাম তো আমরা শুনলাম। এখানেই কিন্তু ঘোড়ার গাড়ির নানান রূপ শেষ হলো না। ঘোড়ার গাড়ি আরও কত রকম যে ছিলো তার শেষ নেই।

কথাটা কি রকম ?

বলছি, শোনো। ঘোড়ার গাড়ি নানা ধরনেরই হয়ে উঠেছিলো। সেটা নির্ভর করতো এর আকৃতি, ক'ঘোড়ার গাড়ি এই সবেরই উপর।

এবার সেগুলো দেখা যাক।

ঘোড়ার গাড়ি ছিলো এই ধরনের ঃ

ব্রুহাম—এক ঘোড়ায় টানা বন্ধ গাড়ি



ফিটন

ফিটন—মাথা গুটিয়ে রাখা প্রথম শ্রেণীর গাড়ি।

ল্যান্ডো—

ল্যান্ডোলেট—

টমটম—

ব্যারুশ—

গিগ—

অফিসযান—

সারাব্যাঙ্ক—

ব্রাউনবেরি—

ছ্যাকরা গাড়ি—ভাড়ার গাড়ি

জুড়ি গাড়ি—দুঘোড়ায় টানা গাড়ি

চৌঘুড়ি—চার ঘোড়ায় টানা গাড়ি

আট ঘুড়ি—আট ঘোড়ায় টানা গাড়ি

দশফুকার—দশ ঘোড়ার গাড়ি।

পাল্কি গাড়ি—পাল্কি বেহারার গাড়ি

ডাক গাড়ি—ডাকের গাড়ি

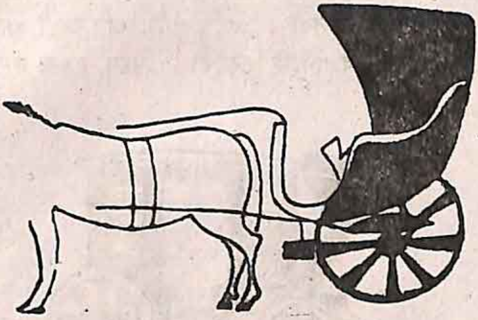
বগি গাড়ি—মাথায় ঢাকনা দেওয়া গাড়ি

দুঘুড়ি—দুঘোড়ার গাড়ি

এক্কাগাড়ি—কলকাতায় বড় একটা চলেনি

গ্রিনফিল্ড—

চেরোট—
ভিক্টোরিয়া—



টমটম

কেরাঞ্চি গাড়ি—কেরাণী বহনের গাড়ি

উপরের নামগুলো দেখে নিশ্চয়ই দারুণ অবাক হয়ে যাচ্ছো। তাই না? তা হওয়ারই কথা। কলকাতা শহরে ঘোড়ার গাড়ি আসার সঙ্গে সঙ্গে এর বিবর্তনও বেশ দ্রুতই ঘটে যেতে শুরু করেছিলো, আর তারই ফলে প্রায়ই নতুন নতুন ধরনের ঘোড়ার গাড়ি রাস্তায় চোখে পড়তে শুরু করেছিলো সকলের। এর মধ্যে একটু মজার কথাও আছে। সেটা কি জানো? দেখি এসো।

ব্যাপারটা হলো, এতো বিভিন্ন রকমের গাড়ি কলকাতার রাস্তায় দেখা গেলেও কিন্তু সব গাড়ি সকলের জন্য মোটেও ছিলোনা। আসলে ওই গাড়ির মধ্যেও লুকিয়ে থাকতো আভিজাত্যও। তাছাড়া পদমর্যাদা তো বটেই।

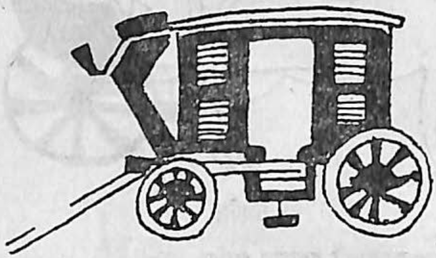
এবার তাহলে একটু দেখা যেতে পারে কোন ধরনের মানুষ কি ধরনের গাড়ি ব্যবহার করতো।

সেটাই এবার দেখি, এসো। তবে একটা মনে রাখা দরকার। সেটা হলো এতো বিভিন্ন রকমের গাড়ির নাম-ধাম মিললেও তাদের সবকটার সব কথা অবশ্য জানা যায়নি। তাছাড়া দুঘুড়ি, চৌঘুড়ি এসবের মানে হলো ক'ঘোড়ার সে গাড়ি টানতো তার উপর।

ল্যান্ডো, ব্রুহাম, ভিক্টোরিয়া, চেরোট, ব্যারুশ—এইসব নামী, দামী, জমকালো, ছিমছাম আর ফিটফাট গাড়ি ব্যবহার করতেন নামী দামী বড় বড় সব মানুষরাই। এঁরা ছিলেন বড় বড় সরকারী কর্মচারি, জমিদার আর পয়সাওয়ালা সব লোকেরাই আর গভর্ণর আর শাসনকর্তারা। পয়সাওয়ালা মানুষজন ছাড়া এসব গাড়ি ইচ্ছে থাকলেও কারও পক্ষে চড়া সম্ভব হতো না। খরচ নেহাত কম হতো না বলেই। তাছাড়া সব গাড়ি সকলের পয়সা থাকলেও চড়ার হুকুম ছিলোনা।

আর সাধারণ মানুষ কি ব্যবহার করতো ?

সে কথা আগেও বলেছি। যেমন ছ্যাকরা গাড়ি, ফিটন, পালকি গাড়ি, কেরাঞ্চী গাড়ি, আফিসযান, এই সবই। এতে গাড়ি অনুযায়ী খরচ কম বেশি হতো। মধ্যবিত্তেরাও এই সব গাড়িই চড়তো। তবে মাঝে মাঝে বেড়াতে যেতেই বেশি।



পালকি গাড়ি

নামী দামী গাড়ি রাখার খরচও ছিলো অনেক। এসব গাড়ি রাখার হাঙ্গামাও ছিলো ঢের। রাখতে হতো কোচোয়ান, সহিস আরও কত কি। যত ঘোড়া তত কোচোয়ান।

সাধারণের ওই সব গাড়ির ভাড়া কি রকম ছিলো ?

হ্যাঁ, এ প্রশ্ন করতে পারো। এবার সেটাই দেখা যাক।

তবে আরও একটা কথাও এর সঙ্গে বলে নিই। সেটা হলো গাড়ি ছাড়া আবার ঘোড়াও আলাদা ভাড়া পাওয়া যেতো।

অতএব ঘোড়া আর গাড়ির ভাড়াও ছিলো এই রকম :—

এক জোড়া ঘোড়া—দৈনিক ভাড়া ১০ টাকা
মাসে ভাড়া ১৫০ টাকা

দুজনের চেরোট গাড়ি—দৈনিক ২০ টাকা
মাসে ৩০০ টাকা

বগি গাড়ি —দৈনিক ৮ টাকা
মাসে ১৫০ টাকা

একজনের গাড়ি —দৈনিক ৪ টাকা
মাসে ১২০ টাকা

এবার মাইল বা দূরত্ব হিসেবে ভাড়া দেখা যাক।

সেটা ছিলো এই রকম :

ফার্স্ট ক্লাস—প্রতি মাইল ৬ আনা
পনেরো মিনিটের জন্য ৮ আনা
আধ ঘণ্টার জন্য ১ টাকা
এক ঘণ্টার জন্য দেড় টাকা

সেকেন্ড ক্লাস—প্রতি মাইল হিসেবে ৪ আনা থেকে ৬ আনা
(ছ্যাকরা গাড়ি)

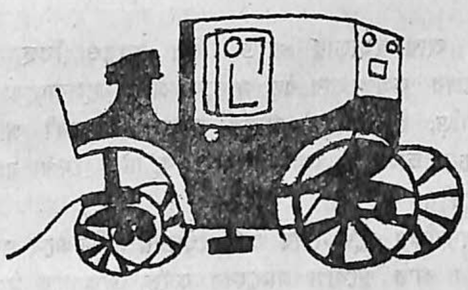
থার্ড ক্লাস—প্রতি মাইল ৩ আনা
আধ ঘণ্টার জন্য ৬ আনা
এক ঘণ্টার জন্য ৮ আনা

একটু ভালো গাড়ি হলে,
যেমন, ফিটন—আধ ঘণ্টার জন্য ১২ আনা
একদিনের জন্য ৪ টাকা

ব্রাউনবেরি—আধঘণ্টার জন্য ৮ আনা
একদিনের জন্য ৩ টাকা

এতো গেলো ঘোড়ার গাড়ি আর ঘোড়ার ভাড়ার কথা। এবার একটু তলিয়ে দেখা যাক সে কালের কলকাতায় একটা ঘোড়ার গাড়ি বানাতে আর ঘোড়া কিনতে খরচই বা কি রকম পড়তো।

১৮৪৩ সালের কথায় জানা যায় একখানা ভালো বগিগাড়ির তখন দাম পড়তো ধরো, ৮০০ টাকা থেকে ১০০০ টাকা। পালকি গাড়ির দাম ৯০০ টাকা থেকে ২০০০ টাকা। একখানা ল্যান্ডো বা ব্রুহাম ২০০০ টাকা থেকে ৪০০০ টাকা।



ব্রুহাম

এবারে ঘোড়ার কথা।

সে যুগে কলকাতায় ঘোড়ার আমদানীও বেশ ফলাও করেই জমে উঠেছিলো। কি ধরনের ঘোড়া এখানে আসতো, শোনো।

যেমন, ওয়েলার, আরবী, টাট্টু, স্ট্যালিয়ন এইসব ঘোড়া। এসব ঘোড়া ছিলো দারুণ টগবগে তেজীয়ান। আবার দামও তেমনি। স্ট্যালিয়ন ঘোড়ায় চড়ে রাজাবাদশার চালে ঘুরে বেড়াতো সব ইংরেজ সাহেব সুবোরা। এই আরবী স্ট্যালিয়ন ঘোড়ার দাম প্রায় ১০০০ টাকা থেকে ২০০০ টাকাই হতো।

এর সঙ্গে ভারি দুঃখের কথাও ছিলো।

সেটা কি বুঝতে পারছো ? সেটা হলো, ওই সব দামী দামী সুন্দর ঘোড়ার সঙ্গে সাধারণ ছ্যাকরা বা কেরাঞ্চী গাড়ির ঘোড়ার তুলনা করলেই ব্যাপারটা বুঝতে পারা যায়। এই সব গাড়ির ঘোড়ার ভাগ্যে তো তেমন যত্ন আত্তি জুটতো না, জুটতো না ভালো রকম দানা পানিও। তাই তাদের দেহ ছিলো একেবারে অস্থিচর্ম-সার।

এর কারণ হলো ঘোড়ার জন্য খরচও তেমন কম ছিলোনা সে যুগে। একটা ঘোড়া পুষতে মাসে কম করেও পড়তো ১৫ টাকা থেকে ২০ টাকা। ভালো চামড়ার সাজ-সরঞ্জামেও লাগতো প্রায় দুশ টাকা। ঘোড়ার দানা-পানির খরচ ছাড়াও ছিলো সহিস কোচোয়ানের খরচ। সে এক এলাহি কাণ্ডই বলতে হয়। সে কালের সব বড় মানুষরা দামী ঘোড়া আর গাড়ির সঙ্গে এসবের জন্য যে টাকা খরচ করতেন ভাবলেও অবাক না হয়ে উপায় থাকে না। আসলে এ থেকে একটা ব্যাপার নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো ?

ব্যাপারটা হলো কলকাতা শহরে ঘোড়ার গাড়ি এলেও সে গাড়ি আর ঘোড়া রাখা সাধারণ মধ্যবিত্তের পক্ষে দারুণ বিলাসিতার কাজই ছিলো। তাই তাদের ভরসা ছিলো সেই ছ্যাকরা বা কেরাঞ্চী গাড়ি ভাড়া করে চড়া।

কথায় কথায় আমরা অনেক দূর এসে পড়েছি। কলকাতা শহর কিন্তু থেমে থাকেনি, সে এগিয়ে চলেছিলো। একটু একটু করে বাড়ছিলো তার গতি আর প্রাণ-স্পন্দন। ঊনিশ শতক শেষ হতেও চলেছিলো একটু একটু করে।

এই ঘোড়া আর ঘোড়ার গাড়ি নিয়ে আরও কিছু মজার কথায় আসি। সেকালের কলকাতার বড় মানুষ আর ফুলবাবুরা তো বাহারি ঘোড়া আর গাড়ি, কোচোয়ান, সহিস, রেখে বাবুয়ানী আর বড়মানুষী ভাব দেখিয়ে চলেছিলেন। এবার একটু খুঁটিয়ে দেখা যাক সে কেমন ধরণের বড় মানুষী।

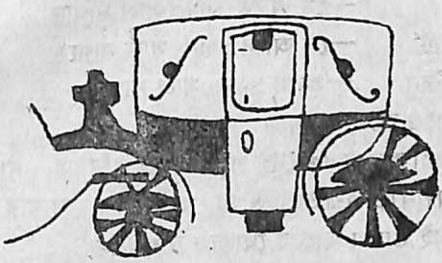
আসলে, পালকির যুগ শেষ হয়ে ঘোড়ার গাড়ি এসে পড়ায় বেশ দ্রুত একটা পরিবর্তন আর সুযোগ মানুষের কাছে, একেবারে মুঠোতেই এসে গিয়েছিলো।

গাড়ির কথাটাই ধরা যাক।

ল্যাণ্ডো, ব্রুহাম, ফিটন, টমটন—কি চমৎকার নামের আর বাহারের গাড়ি। কোনটায় আবার চমৎকার নকশা আঁকা, সোনার জলে লেপা। ভিতরে মখমলের আসন আর গালচেও পাতা। সুন্দর বাতি দান—আর জমকালো পোশাকের কোচোয়ান, সহিস তো ছিলোই। কোন কোন গাড়ির আবার চাল গোটানো—যেমন ফিটন।

যতগুলো ঘোড়া ততজন কোচোয়ানও থাকতো। সেই দুঘুড়ি, চৌঘুড়ি আর আটঘুড়ির কথাটা ভাবো একবার। কিন্তু সস্তা ভাড়ার গাড়ির চেহা

এর কাছাকাছিই আসতো না। সে গাড়ি স্রেফ বাক্সের মত—ভিতরে কাঠের আসন। গাড়ির পিছনে বোঝাই রাখা থাকতো ঘোড়ার জন্য গোছা গোছা ঘাসের বাণ্ডিল। মাঝে মাঝে থামলে ঘোড়াকে ঘাস খাওয়ানোও হতো।



ল্যান্ডো

আট ঘোড়া, দশ ঘোড়া বা দশফুকার গাড়ি চড়তেন ল্যাট লাহেবরা। তারা ওই গাড়ি চড়ে দর্শন দিতেন শহরের মানুষকে।

কলকাতা শহরে লোকজনের সংখ্যাও বাড়ছিলো হু হু করে। পথঘাটও অবশ্য বাড়ছিলো। আর তাতে কি হলো?

হ্যাঁ, এর ফলে কলকাতায় তখন পর্যন্ত মোটামুটি অজানা পথ দুর্ঘটনার সংখ্যাও বাড়তে আরম্ভ করেছিলো।

এর মধ্যে বেশ একটু মজার ঘটনাও ছিলো। লর্ড ওয়েলেসলি আর লর্ড কর্ণওয়ালিশের সময় কলকাতায় ঘোড়ার মত চোখে পড়তো হাতিও। সেটা সেই ১৮০৫ সাল নাগাদও ছিলো। ব্যাপার হলো কি, ওই বিরাট চেহারার হাতিকে দেখে ছ্যাকরা গাড়ির হাড় জিরজিরে ঘোড়া বেচারি দারুন ঘাবড়ে গিয়ে ছুট লাগাতো আর তাতেই ঘটে যেতো দুর্ঘটনা। তখন নবাবী আমলের প্রায় অন্তিম দশা—তাই দু চারটে দুলকি চালে চলা হাঁতির দেখা যে কলকাতা শহরে মিলবে তাতে আর অবাক হওয়ার কি আছে?

ঘোড়ার গাড়ি নিয়ে অনেক কথাই তো আমরা জেনে ফেললাম, তাই না?

কিন্তু একটা কথা এখনও জানা হয়নি।

কথাটা কি আন্দাজ করতে পারছো? কথাটা হলো, এইসব গাড়ি কোথায় তৈরি হতো আর তৈরি করতোই বা কারা?

হ্যাঁ, একথাটাও জানা দরকার। তাহলে চলো এবার সেটাই দেখা যাক।

এবারে একটু একেবারে গোড়ার দিকেই তাকানো যাক। সেই আঠারো শতকের একেবারে শেষের দিকে, যখন বড় বড় রাজকর্মচারিরা ঘোড়া আর ঘোড়ার গাড়ি প্রথম চালু করেছিলেন। ১৭৯০ সাল, এমন কি তারও আগে কলকাতায় সব ইংরেজ ঘোড়ার গাড়ি তৈরির কারিগর বা 'কোচমেকার'রা

আসতে শুরু করে। তারা ভেবেই নিয়েছিলো কলকাতায় বেশ লাভের ব্যবসা শুরু হতে চলেছে—আর হয়েও ছিলো তাই। তাদের মধ্যে ছিলো ঃ

এডওয়ার্ড চ্যান্ডলার—সে আসে ১৭৭৬ সাল নাগাদ

রবার্ট গ্রেঞ্জ —সে আসে ১৭৮০ সাল নাগাদ

জেমস স্টুয়ার্ট —সে আসে ১৭৮২ সাল নাগাদ

জেমস ওয়াটসন —আসে ১৭৮৩ সাল নাগাদ

এই রকম আরও অনেকেই আসে।

কোচ মেকাররা আবার এখানেই শুধু গাড়ি বানাতো না, তারা বিদেশ থেকে গাড়ি আমদানীও করতো, ভাড়া খাটাতো। আবার আস্তাবল তৈরি করে বেশ তাগড়াই ভালো জাতের ঘোড়াও রাখতো।

এদের মধ্যে গোড়ায় ডেক্সটার নামে এক সাহেব খুবই নাম কেনেন। তিনি বৌবাজার এলাকায় বিরাট আস্তাবল বানিয়ে পাঁচ ছ'শো ঘোড়াও রাখতেন ভাড়া খাটানোর জন্য। তিনি আবার ঘোড়ার ডাক্তারও নাকি ছিলেন। তার মানে তার রথ দেখার সঙ্গে কলা বেচাও হতো।

ডেক্সটার সাহেব একা নন। এরকম ব্যবসাদার কলকাতায় বেশ হু হু করেই বাড়ছিলো সে যুগটায়। চাহিদা বাড়ছিলো, তাই।

সবচেয়ে নামকরা কোচমেকার ছিলেন স্টুয়ার্ট কোম্পানীর স্টুয়ার্টরা। তারাই হলেন এই শহরের সবচেয়ে পুরানো আর বহুকাল স্থায়ী কোচমেকার কোম্পানী। গাড়ি তৈরির ব্যবসা প্রথম কিন্তু শুরু হয় ১৭৭৫ সালে কসাইটোলায়। কসাইটোলা কোথায় আগেই একবার বলেছি—বেণ্টিংক স্ট্রীট এলাকায়। ওই বছরেই আবার তাদের কোম্পানী নতুন ঠিকানায়—১ নম্বর ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রীটে উঠে গিয়েছিলো। প্রথম কারখানা হাতে নিয়েছিলেন জেমস স্টুয়ার্ট। তারপর এলেন তার ভাই রবার্ট স্টুয়ার্ট। কোম্পানী তারপর উঠে গেলো ১৯০৭ সাল নাগাদ ম্যাঙ্গো লেনে।

এদের কারখানা কতবড় ছিলো শুনলে নিশ্চয়ই অবাক হয়ে যাবে।

তাদের প্রথম কারখানার এলাকা ছিলো ২ বিঘা ১৮ কাঠার মত। শেষ পর্যন্ত অনেক পরে একেবারে ১৯৩০ সালে বালিগঞ্জে কারখানা বানানো হয় ১৬ বিঘা জমির উপর। তাহলে বুঝতে পেরেছো স্টুয়ার্ট কোম্পানী কি রকম বড় দরের কোম্পানী হয়ে উঠেছিলো ?

এদের কারখানায় কি রকম কাজ হতো ?

হ্যাঁ, সেটাই দেখা যাক এবার।

স্টুয়ার্ট কোম্পানী তাদের কোম্পানীর বিজ্ঞাপনও দিতেন। ওই বিজ্ঞাপন দেখেও সেকালের গাড়ি ঘোড়ার ব্যবসা কেমন চলছিলো তার চমৎকার ধারণা করা যায়। বিজ্ঞপন কেমন হতো দেখা যাক এসো। বিজ্ঞাপন স্টুয়ার্ট কোম্পানী দিতো ইংরাজীতে। এখানে সেটা বাংলাতেই দিচ্ছি ঃ

"বিক্রয়। স্থান ঃ মেসার্স স্টুয়ার্ট'স, কোচমেকার
বৃহস্পতিবার, মার্চ ১৭, ১৭৮৫
একটি নূতন সুন্দর ইউরোপের গিগ ; মূল্য সিক্কা টাকায়।
কোম্পানী চেরোট, ফিটন ও বগি তৈয়ারীতে অভিজ্ঞ।
সেরা ইউরোপীয় বস্তুতে তৈয়ারী। সহজ শর্ত।"

স্টুয়ার্ট কোম্পানীতে আবার নীলামও হতো—সেখানে এ জন্য ভালো ভালো বিদেশী গাড়ি আর ঘোড়াও নীলামে উঠতো। অবশ্য সেকালের বড় মানুষরা ছাড়া আর কেউ তো তাতে হাজির হতে পারতেন না।

স্টুয়ার্ট কোম্পানী তৈরী করতো নানা রকম দামী দামী সব রঙবাহারী গাড়ি। সেগুলো সেকালের সবরকম নামী ঘোড়ার গাড়িই ছিলো। যেমন চেরোট, গিগ্, ফিটন, ল্যান্ডো, ল্যান্ডোলেট, ব্রুহাম, ডাক-গাড়ি, ব্রাউন বেরি, অফিস যান আরও কতো কি। এসব গাড়ির কাজে তাদের দক্ষতা ছিলো একেবারে কিংবদন্তীর মতই। স্টুয়ার্ট কোম্পানী সে কালে বড় বড় নামী মানুষ আর নবাব- রাজা মহারাজার জন্যও গাড়ি বানাতো। তারা নাকি টিপু সুলতানের ছেলেদের জন্যও গাড়ি বানিয়েছিলো। দেশীয় বহু রাজা মহারাজাও তাদের কাছে গাড়ি বানানোর বরাত দিতেন। কাবুলের আমীরকেও তারা গাড়ি তৈরি করে দেয়। সম্রাট সপ্তম এডোয়ার্ডের অভিষেকের জন্যও স্টুয়ার্ট কোম্পানী দিল্লীতে দরবারের জন্য রুপোর হাওদা বানিয়ে দিয়েছিলো। সেটা ১৯০৩ সালে। এমন কি পঞ্চম জর্জের জন্যও তারাই গাড়ি বানিয়ে দেয়।

স্টুয়ার্ট কোম্পানী ছাড়া আর কারা গাড়ি বানাতো ?

হ্যাঁ, আরও অনেকেই ছিলো বৈকি। তাদের মধ্যে আমাদের দেশী মানুষও ছিলো। তারাও কোচমেকারের কাজ করতো।

তাদের নাম ঠিকানা এই রকম :

জর্জ এ্যান্ড কোম্পানী—বেণ্টিঙ্ক স্ট্রীট

সিটন অ্যান্ড কোম্পানী—ঐ

আর বার্টলেট—ঐ

ঈষ্টম্যান কোম্পানী—৯ নম্বর ধর্মতলা স্ট্রীট।

হরিশচন্দ্র বোস — লোয়ার সার্কুলার রোড।

কার অ্যান্ড কোম্পানী —চিৎপুর রোড।

ডাইকস কোম্পানী—ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রীট।

এতো গেলো কোচমেকারদের কথা। আরও কিছু কিছু কোম্পানীও ছিলো যারা আবার ঘোড়া আর গাড়ি যত্ন করে রাখতো। তাদের আবার বলা হতো 'লিভারি ও স্টেবল কীপার'। তারা অবশ্য গাড়ি ঘোড়া নীলামে বিক্রীও করতো সারা বছর ধরে। অনেকেই তাদের কাছে গাড়ি ঘোড়া রাখতে

দিতো। তাতে বেশ হাঙ্গামা কম হতো। এরা সে সব গাড়ি সাফাই করে ঘোড়াদেরও যত্ন করতো, দানাপানি খাওয়াতো—বদলে খরচা নিতো।

এইসব কোম্পানীর মধ্যে সবচেয়ে নামকরা ছিলো কুক অ্যান্ড কোম্পানী। তাদের কোম্পানী ছিলো ৩ নম্বর ধর্মতলা স্ট্রীট। এছাড়াও ছিলো হাণ্টার কোম্পানী। তাদেরও ঠিকানা ২৫ নম্বর ধর্মতলা স্ট্রীট। ধর্মতলা স্ট্রীটের তো তখন আজকের মত এমন জাঁকজমক ছিল না, তাই সেখানেই থাকতো মতো আস্তাবল আর গাড়ি রাখারও জায়গা। এই রকম আরও এক কোম্পানী ছিলো মিল্টন কোম্পানী। তাদেরও আস্তাবল সেই ধর্মতলা স্ট্রীটেই। ভাড়ার গাড়ি মিলতো ভবানীপুর, কালিঘাট, শিয়ালদহ, শ্যামবাজারেও।

একটা মজার ব্যাপারও ঘোড়ার গাড়ি নিয়ে ঘটতো কলকাতায়।

সেটা কি রকম ছিলো ?

সেটা হলো, কলকাতায় তখন একরকম ঘোড়ার গাড়ি থাকতো যার নাম দালাল গাড়ি। এদের কাজ কেমন হতো জানো ? তারা ছোঁ মেরে যাত্রীদের গাড়িতে তুলে নিতো। ভারি মজার ব্যাপার তাই না ?

কথায় কথায় আমরা এগিয়ে এসেছি অনেক দূর। কলকাতায় ঘোড়ার গাড়ি তখন পুরনো হয়ে গেছে, পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে মোটর গাড়ি বা হাওয়া গাড়ির। ঊনিশ শতকের সেই নব জাগরণের দিন পার হয়ে এসে গিয়েছিলো আধুনিক যুগের হাওয়া। কলকাতার সেই জাগরণের দিনে কিন্তু মানুষকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলো ঘোড়ার গাড়িই।

সেই ঘোড়ার গাড়ি নামী মানুষেরাও চড়েছিলেন। কারা জানো ?

সেই মহান সব প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তিরাও। তাদের মধ্যে ছিলেন ডিরোজিও রামকৃষ্ণ পরমহংস দেব, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কেশবচন্দ্র সেন, স্বামী বিবেকানন্দ, বিদ্যাসাগর আর আরও অনেকেই।

দিন এগিয়ে চলেছে। কলকাতার রাস্তায় ছুটে চলেছে ঘোড়ার গাড়ি—নানা ধরনের ঘোড়ার গাড়ি, কত বিচিত্র তার রূপ। কলকাতা ছড়িয়ে পড়ছে উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব আর পশ্চিমে—মানুষ ছুটে আসতে চাইছে ভারতবর্ষের প্রাণকেন্দ্র শহর কলকাতায়।

কলকাতা জাগছে। তা জাগুক, কিন্তু আজকের আধুনিক কলকাতাতে এখনও চোখে পড়ে ঘোড়ার গাড়ি। এখনও সে গাড়ি মেলে হাওড়া স্টেশন চত্বরে আর রাজাবাজারে। ঘোড়ার গাড়ি দেখলে আমরা অবাক হয়ে তাকিয়েও থাকি।

ঘোড়ার গাড়ি থাকতে থাকতেই কিন্তু এসে গিয়েছিলো কলকাতার বুকে অন্য এক ধরণের গাড়ি। মানুষের প্রয়োজনেই তার আবিষ্কার—ঘোড়ার গাড়ি সে প্রয়োজন মেটাতে পারছিলো না।

তার নাম কি জানো ?

হ্যাঁ, তার নাম ট্রাম গাড়ি। তবে ঘোড়ায় টানা ট্রাম।
শক্তির জন্য মানুষকে যে তখনও নির্ভর করতে হতো ঘোড়ার উপরেই।
তাহলে এবার চলো ট্রাম গাড়ির যুগেই প্রবেশ করি।

● পাঁচ ●
কলকাতায় ট্রাম গাড়ি

বড় হয়ে উঠছিলো কলকাতা শহর।

হ্যাঁ, বড় হয়ে উঠছিলো বলেই বাড়ছিলো শহরের সমস্যা আর প্রয়োজন। শুধু পালকি আর ঘোড়ার গাড়ি শহরবাসীর রোজকার প্রয়োজন মিটিয়ে দিতে পারছিলো না একটুও। সে প্রয়োজন মানুষের যাতায়াত আর মালপত্র পরিবহনেরও।

তাহলে সে সমস্যার সমাধান হলো কেমন করে?

খুবই স্বাভাবিক একটা প্রশ্ন।

অনেকদিন ধরেই ওই সমস্যা আর প্রয়োজনের জটিলতায় হাবুডুবু খাচ্ছিলেন সেকালের কলকাতা শহরের কর্তাব্যক্তিরা অর্থাৎ সরকারের যাঁরা মাথা, তারাই। শেষ পর্যন্ত ভেবে চিন্তে তারা একটা উপায় বাতলে দিলেন।

উপায়টা কি ছিলো নিশ্চয়ই জানতে চাও?

সেটাই এবার বলছি।

তখনও দেশের কোথাও মোটর গাড়ি চালু হয়নি। মানুষের যানবাহন ছিলো একমাত্র সেই মান্ধাতার আমলের পালকি আর ঘোড়ার গাড়িই। কিন্তু এগুলোর প্রধান যে অসুবিধে ছিলো তা হলো, পালকি বা ঘোড়ার গাড়িতে খরচও সেকালের তুলনায় বেশি আর একসঙ্গে বেশি মানুষ বা যাত্রীদের যাতায়াতের পথ ছিল না, ছিল না মালপত্র বহন করারও। এটা দারুণ অসুবিধার কথাই ছিলো।

সরকার তাই ভেবে চিন্তে পথ বাতলে দিলেন।

পথটা হলো, কলকাতায় ট্রাম চালাতে হবে, তাতেই জনসাধারণের অসুবিধে দূর হবে। ট্রামই হবে কলকাতার মানুষের দুর্গতি নাশিনী।

কিন্তু ট্রাম কি রকম গাড়ি আর সেটা চলবেই বা কিসে?

দারুণ প্রশ্ন। সেটাই তাহলে দেখা যাক।

● ঘোড়ায় টানা ট্রাম গাড়ি

কলকাতায় ট্রাম গাড়ি চালানোর বন্দোবস্ত করার কথা সরকার ঠিক করেই ফেলেছিলেন। ট্রাম গাড়ি অবশ্য আজকের মত ছিল না—ছিলো একখানা

করে গাড়ি। ফার্স্ট ক্লাস সেকেন্ড ক্লাস আর ছিল আলাদা আলাদা গাড়ি।

কিন্তু এই ট্রাম গাড়ির শক্তি যোগালো কে? ঘোড়া।

হ্যাঁ, এই ট্রাম টেনে নিতো লাইনের উপর দিয়ে একজোড়া করে ঘোড়া।

কিন্তু তার আগে জানা দরকার কলকাতা শহরে ট্রাম চালু হওয়ার ব্যবস্থা কারা কি ভাবে করেছিলেন। ব্যাপারটা তো তেমন সহজ ছিল না। খরচের ব্যাপার বাদ দিলেও, লাইন পাতা, গাড়ি বানানো, ঘোড়ার ব্যবস্থা আর তারও সঙ্গে নানা রকমের সব খুঁটিনাটি কাজ ছিলো বৈকি। তাই নিশ্চয়ই এজন্য দরকার হয়ে পড়েছিলো বিশেষ কোন ব্যবস্থা।

কথাটা ঠিকই। এবার তাই আমরা দেখে নিতে পারি কলকাতায় প্রথম সেই ট্রাম চালাবার দায়িত্ব কাদের উপর দেওয়া হয়।

কলকাতায় ট্রাম চালানোর প্রস্তাব ছিলো কিন্তু ঢের আগেই—সেই ১৮৫০ সালেরই কাছাকাছি। বাঙলা দেশের সেকালের সরকারই প্রস্তাবটা তুলেছিলেন খোদ ভারত সরকারের কাছে। তারা প্রস্তাব করেন ভারত সরকার ট্রাম চালানোর জন্য মূলধনের জোগান আর জামিনদার হলে তবেই কলকাতায় ট্রাম চালাবার ব্যবস্থা করা হতে পারে।

এ নিয়ে বেশ টালবাহানা আর আলাপ আলোচনা চললো দুই সরকারের মধ্যে। শেষ পর্যন্ত ভারত সরকার জানালেন জামিনদার না হয়ে তারা ট্রাম চালানো, লাইন পাতা, এইসব খরচ মেটানোর জন্য বেশ কিছু টাকা কড়ি দেবেন। তারা কাজ আরম্ভ করার কথাও বললেন।

একটা কথা নিশ্চই বুঝতে পারছো?

কথাটা হলো তখন কিন্তু আজকের মত কোন ট্রাম কোম্পানী ছিল না। তাহলে দায়িত্ব কারা নিয়েছিলো? হ্যাঁ, সেটাই এবার দেখি, এসো।

কলকাতা শহর তখন আস্তে আস্তে বড় হয়ে উঠছিলো, এটাতো আগেই দেখে নিয়েছো। বেড়ে গিয়েছিলো শহরবাসীর সংখ্যা, তার পথঘাট। আর তাই শহরের স্বাস্থ্যরক্ষা, পথঘাট বানানো, এসবের জন্য গড়ে উঠেছিলো কলকাতার পুরসভা বা তখনকার মিউনিসিপ্যালিটি। ওই মিউনিসিপ্যালিটির ভার যাদের উপর থাকতো তাদের কি বলা হতো জানো? জাস্টিস অব পীস। তারাই ছিলেন এর কর্মকর্তা।

এখন হলো কি, ভারত সরকার ওই জাস্টিস অব পীসদের হাতেই ১৮৬৭ সালে ক্ষমতা দিয়ে দিলেন যাতে তারা নিজেরা বা অন্য কোম্পানীর সাহায্যে কলকাতার রাস্তায় ট্রাম লাইন বসাতে পারেন আর ট্রাম চালানোরও ব্যবস্থা করতে পারেন।

কিন্তু ততো সহজে কাজটা হতে চাইলো না। আসলে জাস্টিস অব পীসেরা বুঝছিলেন সহজে এ কাজের দায়িত্ব নিতে চাইছিলেন না। কিন্তু সরকার বুঝেছিলেন যানবাহনের ব্যাপারে কিছু করা দরকার। কলকাতায় শহরের

সমস্যা এ না হলে সামলানো যাবে না। তারা তাই চাপ দিতে লাগলেন জাস্টিস অব পীসদের উপরেই যাতে তারা রাজি হয়ে যান আর সেটা কলকাতা-বাসীদের মুখ চেয়েই।

জাস্টিস অব পীসদের কিন্তু ধন্যবাদ জানাতেই হবে—তারা কিন্তু এরপর রাজি হয়ে গেলেন।

সরকারও কিন্তু খুবই আগ্রহ দেখাতে আরম্ভ করলেন। এ ব্যাপারে কলকাতা শহরের বাসিন্দাদের ট্রাম সম্বন্ধে আগ্রহী করে তোলার জন্য তারা একটি সুন্দর প্রদর্শনীও করলেন। তাতে দেখানো হলো ট্রাম সম্বন্ধে নানা রকম তথ্য।

তারপর ?

তারপর সবই ভালোয় ভালোয় হয়ে চললো। কিছু কিছু ছোটোখাটো সমস্যাও কিন্তু দেখা দিলো। ট্রাম চালানোর ব্যাপারে প্রথম কাজ যখন আগে ট্রামের জন্য লাইন পাতা—তখন সে-লাইন পাততে গিয়ে অনেক বাড়ি ঘর, নর্দমা, জলের পাইপ এসব ভাঙা পড়ার কথা। এসব করতে গেলে ক্ষতিপূরণও দিতে হবে। তাহলে ? এ টাকা আসবে কোথা থেকে ?

মুস্কিল আসান হতেও দেরী হলো না। কি ভাবে ?

হ্যাঁ, সে কথাটাই এবার বলছি।

সরকার এসব ব্যাপারে খুঁটিয়ে বিচার করে কত খরচ পড়তে পারে জানার জন্যই একটা কমিটি বসালেন। ভারত সরকারও বলেছিলেন তাড়াতাড়ি কাজ করতে। তাদের কিন্তু ভাবনা ছিলো লোকজন চলাচলের চেয়ে শেয়ালদা স্টেশন থেকে মালপত্র আনা নেওয়া কিভাবে ভালো করে করা যায়।

যাইহোক সরকারের ওই কমিটি সব কিছু বেশ ভালো করে দেখে শুনে তাদের রিপোর্ট দাখিল করলেন।

কমিটিতে কারা কারা ছিলো জানো ?

কমিটিতে ছিলেন কলকাতা মিউনিসিপ্যালিটি, পোর্ট কমিশনার্স আর সরকারের রেল দপ্তরের কর্তা ব্যক্তিরা।

কমিটি রিপোর্ট দিলেন, হ্যাঁ, ট্রাম চালানো যেতে পারে বটে, কিন্তু সেটা আসলে হতে পারে শেয়ালদা থেকে বৌবাজার হয়ে একেবারে গঙ্গার ধার পর্যন্ত ট্রাম লাইন বসিয়ে—আবার সেখান থেকে উত্তরে আর্মেনিয়ান ঘাট, আহিরীটোলা ঘাট হয়ে বাগবাজার হয়ে একেবারে চিৎপুর পর্যন্ত। আর এটা হবে প্রধানত মালপত্র দেওয়া নেওয়া করতে আর বহন করতে। যাত্রীবহনের কথা তারা বলেন নি। ভাবো একবার কথাটা।

যাই হোক, কমিটি তাদের সেই রিপোর্ট দাখিল করেছিলেন ১৮৭০ সালের ২৪শে আগষ্ট তারিখে।

সরকার রিপোর্ট পেয়ে বেশ খুঁটিয়ে সেটা পরীক্ষাও করলেন আর শেষ

পর্যন্ত অনুমতি দিলেন এক লক্ষ টাকা খরচ করে শেয়ালদা স্টেশন থেকে যাতে আর্মেনিয়ান ঘাট পর্যন্ত ট্রাম লাইন পেতে ট্রাম চালানো যায়। আর্মেনিয়ান ঘাটের কথাটা বারবার উঠছে কেন?

হ্যাঁ, এ প্রশ্ন স্বাভাবিক।

ব্যাপারটা হলো কি, আসলে আর্মেনিয়ান ঘাটে ছিলো তখনকার হাওড়ার ইষ্ট ইন্ডিয়ান রেল পথের টিকিট-ঘর। আসলে এই পর্যন্ত লাইন পাতলে সহজেই শেয়ালদার মালপত্র হাওড়ায় আর হাওড়ার মাল শেয়ালদায় আনা যেতো।

পরিকল্পনা তো করা হলো, টাকা পয়সার জোগাড়ও হয়ে গেলো। বাংলা সরকার কথা মত এক লক্ষ টাকা দিলেন সেই জাস্টিস অব পীসদের হাতে যাতে তারা এবার লাইন পাতার কাজটা আরম্ভ করতে পারেন।

কাজে নেমেও পড়লেন জাস্টিস অব পীসরা। ১৮৭৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের মধ্যেই লাইন পাতার কাজ শেষ হয়েও গেলো।

কোথা থেকে কতদূর বসলো সে লাইন?

সেটাই এবারে দেখা যাক।

লাইন বসলো কথামত সেই শেয়ালদা স্টেশনে আরম্ভ হয়ে সার্কুলার রোড বরাবর, বৌবাজার স্ট্রীট পার হয়ে ডালহৌসী স্কোয়ার হয়ে একেবারে স্ট্র্যান্ড রোড ধরে শেষ হলো গিয়ে আর্মেনিয়ান ঘাটে।

টাকা কিন্তু বেশিই খরচ হয়ে গেলো। এক লাখের জায়গায় দেড় লাখ।

উপায় ছিল না, কাজ আরম্ভ করে তো পিছিয়ে আসা যায় না। অতএব দেড় লাখই খরচ করতে হলো। লাইন পাতার কাজও শেষ হয়ে গেলো—এবার গাড়ি চলার পালা। কিন্তু গাড়ি টানবে কিসে?

হ্যাঁ, আগেই তো সেটা ঠিক হয়ে ছিলো। গাড়ি টানার কথা ঘোড়ায়। তাই ভালো ভালো কিছু ঘোড়াও বিদেশ থেকে আনানো হলো। গাড়িও বানানো হয়ে গিয়েছিলো। তবে আজকালকার মত দুখানা করে গাড়ি নয়, আলাদা করে ফার্স্ট ক্লাসের একখানা গাড়ি আর সেকেন্ড ক্লাসেরও দুখানা আলাদা গাড়ি।

তাহলে প্রথম ট্রাম গাড়ি চলতে শুরু করলো কবে থেকে?

প্রশ্নটা খুবই স্বাভাবিক। এবারে সেটাই দেখি, এসো।

সবই ঠিকঠাক অতএব গাড়ি চলার আর বেশি ঝামেলা ছিল না। ঠিক হলো ১৮৭৩ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারী তারিখে প্রথম ট্রাম গাড়ি কলকাতা শহরের বুকে চলতে শুরু করবে।

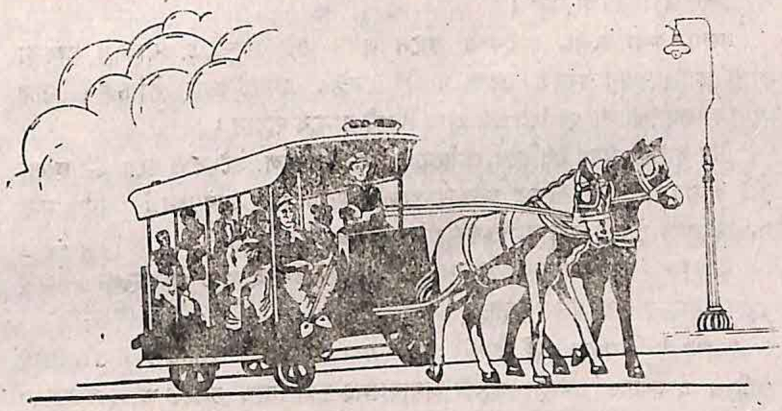
খবর ইতিমধ্যেই সারা শহরটাতেই রটে গিয়েছিলো তাই মানুষের মধ্যে উৎসাহেরও শেষ ছিল না। সবাই আজব ওই কান্ডকারখানা দেখার জন্য অধীর আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছিলো।

ব্যাপারটা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো, কলকাতার মানুষের কাছে ট্রাম গাড়ি ছিলো একেবারেই নতুন ধরনের গাড়ি, তাই তামাশা দেখার জন্যই লোকের মধ্যে হুড়োহুড়ি পড়ে যাবে তাতে আর আশ্চর্য কি। এবার দেখা যাক প্রথম দিন যে ট্রাম চললো সেটা কি রকম হলো।

● প্রথম দিনে যখন ট্রাম চললো

২৪শে ফেব্রুয়ারী ১৮৭৩ প্রথম ঘোড়ায় টানা ট্রাম চললো কলকাতায়। সে এক হৈ-হৈ কান্ড বটে। প্রথম ট্রাম ছাড়বার কথা ছিলো সেই শেয়ালদা স্টেশন থেকে। তাই সারা শহরের মানুষ যেন ভেঙে পড়লো শেয়ালদায়। সকাল থেকেই ট্রাম চালানোর দায়িত্ব যাঁদের উপর সেই ট্রামের কর্তা মিঃ সি. এফ. অ্যাবরো আর ইঞ্জিনিয়ার মিঃ ক্লার্ক দারুণ ব্যস্ত রইলেন।

কথা ছিলো প্রথমে তিনটি গাড়ি ছাড়বে সেখান থেকে। তবে আগেই বলেছি তিনটে গাড়ি একসঙ্গে নয়, আলাদা আলাদা তিনটে গাড়ি। ফার্স্ট



ঘোড়ায় টানা ট্রাম

ক্লাস একটা আর সেকেন্ড ক্লাস দুটো। প্রত্যেকটা গাড়ির সঙ্গে তেজীয়ান টগবগে দুটো করে ঘোড়া গাড়ি টানার জন্য তৈরি।

এটা যেন অনেকটা দার্জিলিংয়ের সেই টয় ট্রেনের মত। যারা টয় ট্রেন চড়েছো তারা বুঝতে পারবে ব্যাপারটা কি রকম মজার। পর পর তিনটে ট্রাম-ট্রেনই যেন তৈরি।

এদিকে সকাল ৯-১৫। শেয়ালদা স্টেশনে ততক্ষণে ইষ্টবেঙ্গল রেলওয়ের ট্রেনও হাজির। পাগলের মতই যাত্রীরা হৈ-হৈ করে ছুটে এসে আগে ভাগে টিকিট কেটে সেকেন্ড ক্লাস ট্রামে উঠতে শুরু করলো। দেখতে দেখতেই ট্রামের বগি একেবারে ভর্তি হয়ে উপচে পড়লো।

ট্রামে আসন ছিলো কত ?

ট্রামের বগিতে আসনের সংখ্যা ছিলো ৪৫টি। ৪৫টা আসন কখন যে ভর্তি হয়ে গেলো তা বোঝা গেলো না, আরও লোক উঠতেই লাগলো। বগি ভর্তি হয়ে এবার লোক ছাদে চড়তে শুরু করলো আর ছাদও যখন কানায় কানায় ভর্তি তখন সবাই বাদুড়ের মত ট্রামের গায়ে ঝুলতে শুরু করলো, কে কার কথা শোনে। শেষ পর্যন্ত গলদঘর্ম হয়ে সকলের সাঁদিগর্মির জোগাড়।

ব্যাপারটা কি রকম বুঝেছো ? প্রথম দিনে ট্রাম না চড়লে যেন মান থাকবে না এমনই লোকের ধারণা হয়েছিলো বোধহয়। তবে আজকের কলকাতা শহরটায় এমন দৃশ্য তো আকছবারই চোখে পড়ে, কি বলো ? সে কালের শহরবাসীর আর দোষ কি! তাদের কাছে তো সব ব্যাপারটাই নতুন কিছু।

যারা অতো কষ্ট করে এসেও ভিড়ের জন্য জায়গা পেলোনা তারা তো দুঃখে একেবারে ভেঙে পড়তে চাইলো। এতো গেলো সেকেন্ড ক্লাসের অবস্থা। ফার্স্ট ক্লাসের ব্যাপারটা কেমন ছিলো ?

সেটা এবার দেখা যাক।

মজার কথা হলো, সেকেন্ড ক্লাসে যখন ওই কিম্ভূতকিমাকার অবস্থা ফার্স্ট ক্লাসে তখন বলতে গেলে যাত্রীই নেই। মোটে জনা পাঁচেক। তার মধ্যে লালমুখো সাহেব তিনজন আর দিশী মানুষ দুজন।

ট্রাম ছাড়ার সময় পেরিয়ে যাচ্ছিলো আর সকলে অধৈর্যও হয়ে উঠছিলো তাই আর দেরী করা উচিত হবে না বলেই কর্তারা মনে ভাবলেন। সাড়ে নটা নাগাদ প্রথম ট্রামটা ছাড়ার সঙ্কেত দেওয়া হলো।

কলকাতা শহরের জীবনে প্রথম ট্রাম এইভাবেই গতিশীল হলো। এই ভাবেই ট্রামের যাত্রা হলো শুরু।

প্রথম ট্রাম, অর্থাৎ সেই ফার্স্ট ক্লাসে তো সাকুল্যে পাঁচজন যাত্রী, তাই গাড়িও হালকা। ঘোড়া দুটো অনায়াসেই ট্রাম নিয়ে চলতে শুরু করলো। টুক টুক করে লাইন বরাবর এগিয়ে চললো সে গাড়ি। দুগ্‌গা দুগগা বলে গাড়ি চললো।

কিন্তু দ্বিতীয় ট্রাম, মানে সেই সেকেন্ড ক্লাস ট্রামটার অবস্থা কি রকম ?

কথাটা ভাববার মতই। দ্বিতীয় ট্রামের অবস্হা সত্যিই সঙ্গীন হয়েই উঠেছিলো। বুঝতেই পারছো কেন। এতো লোক সে গাড়িতে উঠেছিলো যে বেচারি ঘোড়াদের পক্ষে সে গাড়ি একচুল নাড়ানোরও ক্ষমতা হলো না।

সাহায্য করতে এবার এগিয়ে এলেন ইষ্টবেঙ্গল রেলওয়ের ট্রাফিক সুপারিন্টেন্ডেণ্ট মিঃ ব্র্যান্ডার। তিনি চাবুক দিয়ে সপাং সপাং ঘোড়াদের পিঠে মারতে শুরু করলেন। কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা !—গাড়ি যেখানে ছিলো সেখানেই রয়ে গেলো। একটুও এগোলোনা। শেষকালে ট্রাম কর্মচারীরা দলবেঁধে গাড়ি ঠেলে এগিয়ে দিতে এলো। তাতে কাজ হলো, একটু একটু

গাড়ি এগোলো। চালু হলো দু নম্বর ট্রাম।

কলকাতার জীবনও এবার গতিশীল হতে শুরু করলো।

পালকি, ঘোড়ার গাড়ির পর এই ট্রাম গাড়ি। এবার অনেক মানুষের একসঙ্গে যাতায়াতের ব্যবস্থাই হয়েছিলো।

কিন্তু সেকথা থাক, এবার আবার আসা যাক প্রথম দিনে ট্রাম চলার কথায়।

দ্বিতীয় দফার ট্রামও ছাড়ার জন্য ততক্ষণে তৈরি ছিলো। ৯-৫৫ মিনিটে ট্রেন আসার পর তার চলার বন্দোবস্ত হলো।

এবারে যাত্রীদের মধ্যে বেশ কিছু লালমুখো সাহেব উঠলো তারা অবশ্য ফার্স্ট ক্লাসেই। কিন্তু সেকেণ্ড ক্লাসের অবস্থা তথৈবচ অর্থাৎ সেই ভিড়ে ভিড় —ভিড় যেন আগের চেয়েও ঢের বেশি। তাই ব্যবস্থা হলো সেকেণ্ড ক্লাসই আগে যাবে, ফার্স্ট ক্লাস পরে। কিন্তু তাতেও ঝামেলা—সাহেব যাত্রীরা ক্ষেপে আগুন, তাদের সম্মানে লাগলো।

তা যাই হোক, সেই ব্যবস্থাই বহাল রইলো। প্রথম সঙ্কেত পেয়ে সেকেণ্ড ক্লাস ট্রাম ছাড়লো। তারপরেই ফার্স্ট ক্লাস। দুলকি চালে লাইন ধরে এগোলো গাড়ি।

প্রথম ট্রাম আস্তে আস্তে চলে বৈঠকখানা স্ট্রীট পার হয়ে একেবারে ডাল-হৌসীতে গিয়ে পেঁছিলো। এর পিছনে চললো দ্বিতীয় গাড়িখানাও। সেও শেষ পর্যন্ত ওই ভাবেই চলতে চলতে পেঁছে গেলো লাইন বরাবর প্রথম গাড়ির পিছনে। সব ভালোয় ভালোয় মিটলো।

মজার কথা হলো, প্রথম দিনে কলকাতা শহরে ট্রামে যত মানুষ চড়েছিলো তার চেয়ে ঢের ঢের বেশি মানুষ কিন্তু মজা দেখতেই ভিড় করেছিলো। সে এক এলাহি কাণ্ড। হাজার হাজার ছেলে বুড়ো হুড়োহুড়ি করে কাতার দিয়ে ট্রাম লাইনের দুপাশে রাস্তায় দাঁড়িয়ে মজা দেখছিলো। তাদের কাছে ঘোড়ায় টানা লাইন ধরে চলা এমন গাড়ির ব্যাপারটাই ছিলো ভারি আশ্চর্য ব্যাপার।

তার চেয়েও কিন্তু আরও মজার কাণ্ড ঘটেছিলো।

সেটা কি রকম জানো?

এবার সে কথাই বলছি। হাজার হাজার মানুষ যেমন রাস্তার দুপাশে দাঁড়িয়ে ট্রাম গাড়ি চলতে দেখছিলো তেমনি আবার বাঙালীটোলার বহু মানুষ ওই ট্রাম চলতে শুরু করলে তার পিছনে ছুটতে শুরু করেছিলো। ছুটতে ছুটতে তারা সেই ডালহৌসীতেই গিয়ে থেমেছিলো। কি অদ্ভুত কাণ্ড একবার কল্পনা করে নাও।

কিন্তু আসলে আশ্চর্য হওয়ার বোধহয় কিছু নেই।

শুধু ব্যাপারটার সঙ্গে একটু আজকের কলকাতা শহরের মানুষের অর্থাৎ আমাদের কাণ্ডকারখানাই একবার মিলিয়ে নিতে পারো। আজকের

কলকাতার রাস্তায় নতুন কিছু দেখলে কি ভিড় উপচে পড়েনা ?

আসলে কলকাতার মানুষের স্বভাবখানাই বরাবর একই রকম রয়ে গেছে, একটুও বদলায় নি, তাই না ?

তখনকার ট্রামচালক আর অন্য সব কর্মীদের পোশাক কি রকম ছিলো ? সেটাও ভারি মজার ছিলো। তারা তখনকার দিনের পাহারাওয়ালাদের মতই লাল পাগড়ি মাথায় এঁটে ট্রামের পাদানীতে দাঁড়িয়ে থাকতো। ট্রামগাড়িরও বিশেষ ধরনের রঙ হতো—অনেকটা ধূসর পাশুঁটে রঙ।

ঘোড়াদের মাথায় থাকতো শোলার তৈরি কান ফুটো করা এক ধরনের টুপি। ঘোড়াগুলো হতো খুব তাগড়াই বিদেশ থেকে আমদানী করা ওয়েলার ঘোড়া, আর প্রচুর পরিশ্রমও করতে পারতো তারা।

সেকালের কাগজে কলকাতা শহরের প্রথম ঘোড়ার গাড়ি চলার দৃশ্যের কথাটা আবার ইংলিশ ম্যান কাগজে ১৮৭৩ সালের ২৫শে ফেব্রুয়ারী প্রত্যক্ষ-দর্শীর বর্ণনাতেও বেরিয়েছিলো। আসলে সমাজের সব স্তরেই হৈ চৈ তুলেছিলো ঘোড়ায় টানা আজব ওই ট্রাম গাড়ি।

কলকাতা শহরে ট্রাম চালু হলো ঠিকই, কিন্তু সেটা কি ঠিক মত চলেছিলো ?

হ্যাঁ, এ প্রশ্ন করা যায় নিশ্চয়ই।

এর উত্তর হলো, না, ঘোড়ায় টানা এই প্রথম বারের ট্রাম দুঃখেরই কথা, চলেনি বেশিদিন।

কিন্তু কেন চললো না তার কারণগুলো এবারে একটু দেখে নিই এসো।

কলকাতায় ঘোড়ায় টানা ট্রাম চলার লাইনের খরচ জুগিয়েছিলেন সরকার এটা আমরা আগেই দেখেছি। কিন্তু ট্রাম চালানোর দায়িত্ব ছিলো কলকাতা মিউনিসিপ্যালিটির সেই জাস্টিস অব পীসদের উপর।

জাস্টিস অব পীসরা ট্রাম চালানোর দায়িত্ব নিয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই তারা দেখতে পেলেন ট্রাম চালিয়ে লাভতো দূরের কথা দারুণ ক্ষতিই হয়ে চলেছে।

কি রকম ক্ষতি ?

এবারে সেটাই দেখা যাক।

ঘোড়ার টানা ট্রামগাড়ি চালানোর জন্য দরকার ছিলো গাড়ি তৈরী, ঘোড়ার খরচ, আরও নানা রকম সব সরঞ্জামের খরচ, কর্মচারীদের মাইনে, এই রকম কত কিছু। গোড়ায় ওইসব সরঞ্জাম আর গাড়ি বসাতেই খরচ হয় প্রায় ৩০ থেকে ৪০ হাজার টাকা। এতো গোড়ার দিকের খরচ। এর পরেও মাসে মাসে খরচ তো ছিলোই। সেটাও নেহাত কম নয়, প্রায় ২০০০ টাকার মত।

কিন্তু মাসে ট্রাম চালিয়ে আয় দাঁড়ালো মোটে ৫০০ টাকার মতই। প্রায়

হাজার দেড়েক টাকা করে লোকসান হতে লাগলো। এমনভাবে লোকসান দিয়ে তো আর ট্রাম চালানো সম্ভব নয়, তাই জাস্টিস অব পীসেরা গাড়ি চালানো বাধ্য হয়েই বন্ধ করে দিলেন। কলকাতায় ঘোড়ায় টানা প্রথম বারে ট্রাম তাই বন্ধ হয়ে গেলো ২০শে নভেম্বরের ১৮৭৩ সালের পর থেকে। প্রায় ৯ মাস চলেছিলো ওই ট্রাম। ২০শে নভেম্বর তারিখ পর্যন্তই ট্রাম চলেছিলো।

ট্রাম চালাতে এই লোকসান আর তার জন্য দায়ী যেসব কারণগুলো ছিলো তার কথা একটু আলোচনা করে নিশ্চয়ই দেখা যেতে পারে। কি বলো? তাহলে এসো তাই এবার করা যাক।

আসলে আয়ের চেয়ে ট্রাম চালানোর খরচটাই হয়ে দাঁড়িয়েছিলো অনেক বেশি সেটাতো আমরা আগেই দেখেছি। সেই আয় দাঁড়িয়েছিলো যেখানে মাসে মাত্র পাঁচশ টাকা খরচের ধাক্কা সেখানে ২০০০ টাকারও উপর।

এখন একটা কথা ভাববার মত নিশ্চয়ই।

সেটা কি কথা?

হ্যাঁ, প্রশ্নটা ঠিকই। ব্যাপারটা হলো, ট্রাম চালানোর আগে নিশ্চয়ই কিছুটা ভাবনা চিন্তাও করা হয়েছিল—এই যেমন ট্রাম চালালে মোটামুটি আয় ব্যয় কেমন দাঁড়াতে পারে, এই সবই।

হ্যাঁ, সেটা অবশ্যই করা হয়েছিলো। যে কোন পরিকল্পনা রূপায়িত করতে গেলে এরকম তো করতেই হয়।

আসলে ভুল বা গোলমালটা হয়েছিলো অন্য কোন জায়গাতেই। সে কথাই এবার বলছি।

ব্যাপারটা হলো, কলকাতায় ঘোড়ায় ট্রাম চালাবার প্রথম আর আসল উদ্দেশ্যই ছিলো মাল পরিবহন। আর সেটা করা হলে টাকাও উঠে আসতো নির্ঘাৎ, আর তাহলেই লোকসান মোটেই ঘটতো না। কিন্তু কলকাতার বুকে ট্রাম চলতে শুরু করতেই কিন্তু ঝাঁপিয়ে পড়েছিলো শহরবাসীরা। তারা যাত্রী পরিবহনের জন্যই ওই ট্রাম গাড়ি এটাই ধরে নিয়েছিলো। ব্যাস, তাইতেই সবকিছু গোলমাল হয়েগেলো—মাল বয়ে নেওয়ার কাজটা আদতেইঘটলো না। শুধু মাত্র সামান্য ভাড়ায় যাত্রী নিয়ে ট্রামে লাভ করার প্রশ্নই ছিলো না।

শুধু কম গাড়ি ভাড়াই নয়, আরও ঢের কারণও ছিলো লোকসানের মাত্রা ক্রমেই বেশি হওয়ার।

সেটা কি?

হ্যাঁ, এবার তাই দেখা যাক।

একজন প্রত্যক্ষদর্শী সেকালে যা লিখেছেন তাই বলছি। তিনি লিখে গেছেন ট্রাম চালানোর দায়িত্ব যাঁদের উপর ছিলো তারা একেবারে অস্ট্রেলিয়া থেকে ট্রাম চালানোর জন্য গাদা গাদা দামী সব ওয়েলার ঘোড়া আনিয়েছিলেন। খুবই শক্তিমান, তেজি ঘোড়া। এমন ঘোড়া ছাড়া ট্রাম টানবে কি করে?

কিন্তু এতে খরচও হতো খুবই বেশি রকম। এই সব ঘোড়া ট্রাম টানতে গিয়ে খুবই ক্লান্ত হয়ে পড়তো আর খুব বেশি সংখ্যায় মারাও পড়তো আর তাই দারুণ খরচের বোঝাও বেড়ে চলেছিলো। একে তো গরমের দেশ, প্রচণ্ড রোদ্দুরে ঘোড়ারা দারুণ অসুস্থ হয়ে সর্দিগর্মীতেই মারা পড়তো। বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসের দুপুরের গরম ঘোড়ারা সহ্য করতে পারতো না মোটেও।

অবশ্য রাস্তার কিছু দূরে দূরে ঘোড়া বদল করারও ব্যবস্থা রাখা থাকতো—সেখানে থাকতো আস্তাবল। ঘোড়ারা অক্ষম হয়ে পড়লেই সেখানে আবার ঘোড়া বদলে নতুন ঘোড়া লাগানো হতো। রাস্তার কোথাও কোথাও আবার ঘোড়াকে জল খাওয়াবার ব্যবস্হাও ছিলো। এর জন্য রাস্তার ফুটপাথে মোড়ে মোড়ে ঘোড়ার জল খাওয়ার জন্য বড় আটকানো বিশেষ পাত্রে জলও রাখা থাকতো। কিছুদিন আগে পর্যন্তও কলকাতার অনেক ফুটপাথে সেই পাত্রের দেখাও মিলতো। ঘোড়ার ট্রাম গাড়ি কলকাতা থেকে অদৃশ্য হয়ে গেলেও পাত্রগুলো তার স্মৃতি বহন করে চলেছিলো বলা যায়, তাই না ?

আসল কথাটা হলো, ট্রাম চালাতে গিয়ে এই ঘোড়ার ব্যাপারটাই হয়ে দাঁড়িয়েছিলো বিরাট সমস্যা আর দারুণ খরচের। এই সব ব্যবস্থা করতে গিয়ে, ঘোড়া বদলের জন্য গাদা গাদা ঘোড়া রাস্তার মোড়ে মোড়ে রাখার জন্য প্রচুর খরচ হয়ে চলেছিলো—আর গরমের জন্য ঘোড়াগুলো মৃত্যু বরণও করে চলে খরচের মাত্রাটাও বাড়িয়ে চলেছিলো। এমন ক্ষতি কি সামলানো সহজ ? বাড়তি ঘোড়ার খরচ, কম যাত্রী ভাড়া, মাল পরিবহন করতে না পারা, এতো সব কারণেই ট্রাম চালানোর পুরো পরিকল্পনাটাই একেবারে বিশ্রী রকম জটিল ব্যাপার হয়ে উঠেছিলো।

শেষ অবধি কি হলো ?

সেটা তো আগেই দেখেছি। জাস্টিস অব পীসরা ট্রাম চালানোর ক্ষতি আর সহ্য করতে না পেরে ট্রাম বন্ধ করে দিলেন। সে ঘটনা সেই ১৮৭৩ সালের ২০শে নভেম্বরের।

ট্রাম বন্ধ হয়ে গেলে চারদিকে কিন্তু নিন্দা আর সমালোচনা সেকালেও কিছু কম ঘটেনি। অনেকেই অনেক কথা বলতে শুরু করলেন। কাগজেও বেশ ফলাও করে লেখা হয়ে চললো। কেউ নিন্দা করতে লাগলেন কলকাতা মিউনিসিপ্যালিটির জাস্টিস অব পীসদের, আবার কেউ কেউ খোদ সরকারকেই দোষ দিলেন। অনেকেই বললেন শুধু শিয়ালদা থেকে আর্মেনিয়ান ঘাট পর্যন্ত ট্রাম চালালে লোকসান তো হবেই—বরং সারা শহরটাতে ঘোড়ার ট্রাম চালালে লোকসান হবে না। তাছাড়া মালও নিতে দেওয়া হোক।

কেউ কেউ আবার আরও একটু এগোলেন। তারা কি বললেন জানো ? তারা বললেন, ট্রাম চালানোর দায়িত্বটা কোন ব্যবসাদারের হাতে তুলে দেওয়া হোক তাহলে আর লোকসান থাকবে না।

ভারত সংস্কারক নামে একটা কাগজ সরাসরি সরকারকেই দোষারোপ করে বলে দিলো সরকার জাস্টিস অব পীসদের লোভ দেখিয়ে বিপদে ফেলে দিয়েছেন। তারা বললেন ঘোড়ায় টানা ট্রাম চালানোর আগে আরও ভেবে চিন্তে দেখা উচিত ছিলো। তারা এমনও বললেন এমনভাবে ট্রাম বন্ধ করাও উচিত হয়নি আরও চালানো উচিত ছিলো।

আসলে কিন্তু একটা ব্যাপার অস্বীকার করার উপায় নেই।

সেটা হলো, মাত্র শিয়ালদা থেকে আর্মেনিয়ান ঘাট পর্যন্ত ট্রাম চালিয়ে লাভ করার কোন পথ সত্যিই ছিলোনা, তা যাত্রী সংখ্যা যতই হোক না কেন। সেকালের শহরবাসীর সংখ্যাটা ভেবে নেওয়াও জরুরী কি বলো?

তাহলে, লাভ হতে পারতো কি ভাবে?

হ্যাঁ, এটা দেখা চলতে পারে।

লাভ হতে পারতো নিঃসন্দেহে ট্রাম লাইন শহরের আরও সব নতুন নতুন এলাকা পর্যন্ত বসিয়ে ট্রাম চালানোর ব্যবস্থা করলে।

এ কথাটা জাস্টিস অব পীসরাও কিন্তু বুঝতে পেরেছিলেন। কিন্তু সেরকম কাজে আর সাহস পেয়ে টাকা ঢালতে রাজী ছিলেন না। আসলে তারা আর ঝক্কি ঝামেলা পোহাতেই রাজি হলেন না।

আরও ট্রাম লাইন বসিয়ে লোকসান কমতো কিনা সেটা কিন্তু সন্দেহেরই কথা। কারণ কি জানো?

কারণ, ভাড়াতো আর তেমন কিছু ছিলোনা সেকালে। আর আজকের কলকাতার তুলনায় সেকালের লোক সংখ্যার তো কোন রকম তুলনা করাই হাস্যকর।

এবার তাহলে একটু দেখা যেতে পারে সেকালের ঘোড়ায় টানা ওই ট্রাম গাড়ির ভাড়া কি রকম ছিলো, আর ট্রামই বা কেমন ছিলো।

● প্রথম যুগের ট্রাম ও তার ভাড়া

প্রথম যুগে, মানে কলকাতা শহরে ঠিক যখন ট্রামগাড়ি চলতে শুরু করেছিলো তখন যে কলকাতার মানুষদের মধ্যে উৎসাহ উদ্দীপনার অভাব ছিলোনা সেটা তো আগেই দেখেছো। তা সে ট্রাম ঘোড়াতে টেনেছিলো, তবুও। আসলে ওই ট্রাম একটু নতুন আস্বাদই বয়ে এনেছিলো।

এখন দেখা যাক ওই আদি যুগে ট্রামগাড়ির ভাড়া কেমন ছিলো। আমরা তো দেখেছি ট্রাম চালাতে গিয়ে বেচারি জাস্টিস অব পীসরা একেবারে লোকসান দিয়ে কাহিল হয়ে পড়ে শেষ পর্যন্ত ট্রাম চালানোই বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়েছিলেন।

ট্রাম চলতে শুরু হয়েছিলো কবে?

হ্যাঁ, সেটাতো তোমরা দেখেছো ১৮৭৩ সালে। তখনকার কালে শহর-বাসীদের ভাড়া কত জানাবার জন্য বিজ্ঞাপন দিতেন ট্রাম চালানোর যারা দায়িত্বে ছিলেন তারা। এরকম বিজ্ঞাপন দেওয়া হতো পত্রিকার মধ্যেও। তখনকার যুগে ট্রামভাড়া কি রকম ছিলো সেটা বহু গবেষকের লেখাতেই এইরকম পাওয়া যায় ঃ—

শেয়ালদা থেকে ডালহৌসী—(তখনকার) এক আনা
বৌবাজার থেকে আর্মেনিয়ান ঘাট—এক আনা
শেয়ালদা থেকে আর্মেনিয়ান ঘাট—এক আনা
চিৎপুর থেকে কটন স্ট্রীট—এক আনা
চিৎপুর থেকে লালবাজার—ছ পয়সা
চিৎপুর থেকে আর্মেনিয়ান জেটি—দু আনা
বিডন স্ট্রীট থেকে আর্মেনিয়ান জেটি—দু আনা

আবার মজার কথা হলো, এই ভাড়া ছিলো কাঠের বেঞ্চির ভাড়া। সামনের গদীতে বসলে ভাড়া হতো আরও দুপয়সা বেশি। মাঝ পথে নামলে সব জায়গাতেই এক আনা।

ট্রাম কেমন দেখতে ছিলো তার মোটামুটি বর্ণনা তো আগেই দেখেছো। এবার একটু দেখা যাক সত্যি সত্যি সেই ঘোড়ায় টানা ট্রামগাড়ি কেমন ধরনের ছিলো।

সে যুগের ট্রামের ছবি কিন্তু আজও দেখা যায়। হয়তো কেউ কেউ তোমরা দেখেও থাকবে।

ঘোড়ায় টানা ট্রামের ফার্স্ট ক্লাস আর সেকেন্ড ক্লাস আলাদা আলাদা গাড়িই থাকতো, সেটাও তোমরা আগেই দেখে নিয়েছো। ট্রামের কোচ বা গাড়িতে থাকতো দুপাশে পাঁচটা করে দশটা দরজা। এতে কেমন সুবিধা বুঝেছো? হ্যাঁ, গাড়িতে দুদিক দিয়েই ওঠা নামা করতে পারা যেতো। তখন তো আপ ডাউন গাড়ি পাশাপাশি চলার ফলে দুর্ঘটনার ভয় থাকতো না।

ফার্স্ট ক্লাস বা সেকেন্ড ক্লাস দুটোতেই একই রকম কায়দা থাকতো। ফার্স্ট ক্লাসে থাকতো আজকের মত গদী আর ভাড়াও একটু বেশি।

গাড়ি চলার রাস্তায় এক মাইল তফাতে থাকতো ঘোড়ার আস্তাবল। সেখানেই ঘোড়া বদল করে দেওয়া হতো। জোড়াসাঁকো, হ্যারিসন রোডের মোড়, ডালহৌসী স্কোয়ার, এই সব জায়গাতেই ছিলো ঘোড়া বদলের আড্ডা।

ঘোড়ার ট্রামগাড়ি চলার সময় বেশ মজার ঘটনাও ঘটতো।

সেটা কি রকম জানো?

দেখাই যাক।

প্রচণ্ড গরমে কিন্তু ঘোড়াদের দারুণ কষ্ট হতো, তারা সর্দিগর্মীতেও

মাঝে মাঝে মারা পড়তো তোমরা সেটাও জেনেছো। তখন গরমের দিনে আর এমন কি অন্য সময়েও ঘোড়ারা বেশি ভার টানতে আপত্তি জানাতে চাইতো। চাবুক মারলেও তারা অনেক সময়ে নড়তো না—বা কখনও কখনও একটু বাইরের দিকে লাইন ছেড়ে দাঁড়িয়ে তাদের আপত্তি জানাতো। আবার কখনও কখনও পিছন দিকে দারুণ জোরে লাথি ছুঁড়তে শুরু করতো।

এই রকম লাথি মারার ফলে যাত্রীরা ভয় পেয়েও যেতো। যাঁরা সামনের দিকে থাকতেন তাঁরা আবার ঘোড়ার লাথি খাওয়ার ভয়ে মাঝে মাঝে গাড়ি ছেড়েও চম্পট দিতেন।

আজকের মত তখনকার ট্রাম বিদ্যুতে না চললেও কিন্তু ট্রামের একজন চালক ঠিকই থাকতো। তার কাজ কি ছিলো?

হ্যাঁ, সেটাও দেখা যাক।

চালকই ঘোড়াকে সামলাতো। যদিও তারও যে লাথি খাওয়ার ভয় থাকতো না তা নয়। ঘোড়া চলতে আপত্তি জানালে তাকেই নেমে ঘোড়াকে ঠিক জায়গায় দাঁড় করিয়ে ট্রাম চলার ব্যবস্থা করতে হতো।

মাঝে মাঝে মজা তো আরও জমে উঠতো। হাজার চেষ্টাতেও আর ঘোড়া চলতে চাইতো না। তখন ঘোড়াকে পিছনের কোন কোন গাড়ির ঘোড়া খুলে এনে লাগানো হলে তবেই ট্রাম চলতো।

তাহলে দেখছো, সে কালে হাঙ্গামাও নেহাত কম ছিলো না ট্রাম চালাতে।

অনেক সময় আরও ঝামেলা বাড়তো। নানা কায়দা করেও যখন ঘোড়া নট নড়ন চড়ন হয়ে থাকতো, তখন যাঁরা আগে ভাগে টিকিট কেটে গাড়িতে চড়বেন তাড়া ছিলো বলে, তারা গালামন্দ করতেকরতে গাড়ি ছেড়ে নেমে হাঁটতে শুরু করতেন। বেচারিদের আর উপায় থাকতো না। মাঝে মাঝে যাত্রীরাও ঠেলে ঠুলে গাড়ি চালানোর চেষ্টা করতেন। এমনই ছিলো সে কালের ট্রাম চড়ার মজা।

কিন্তু শুধু সেকালের দোষ দেওয়া যায় কি তোমারই বলো? কেননা আজকের কলকাতা শহরেও এমন দৃশ্য নতুন নয়। মাঝে মাঝে কোন গাড়ি থমকে গেলে যাত্রীরাই তো সে গাড়ি ঠেলে দিতে চান।

তবে ট্রামগাড়ি অবশ্য নয়।

লোকসান দিতে দিতে ট্রাম অবশেষে একদিন চলা বন্ধ করলো। এই নিয়ে নানা ব্যাখ্যা আর পরস্পর দোষারোপের ব্যাপারটাও তো দেখেছো আগেই। কিন্তু সে সব বাইরের লোকের কথা—অর্থাৎ যারা ট্রাম চালানোর কাজটা করতেন সেই জাস্টিস অব পীসদের কথা নয়।

জাস্টিস অব পীসরা ট্রাম বন্ধ করে দেওয়ার কি রকম কৈফিয়ৎ দিয়েছিলেন? হ্যাঁ, সেটাই এবার দেখি, এসো।

সে সময় কলকাতা পুরসভা বা মিউনিসিপ্যালিটির কর্তাব্যক্তি ছিলেন

হগ সাহেব—স্যার স্টুয়ার্ট হগ। **হগ সাহেবের নামেই স্থাপন করা হয়েছিলো হগ মার্কেট**। এটাই কলকাতার সবচেয়ে বড় বাজার বা মার্কেট।

জাস্টিস অব পীসদের বিরুদ্ধে অনেকে অনেক কথাই বলছিলেন। সকলেই বলছিলেন তাদের জন্যই কলকাতার ট্রাম বন্ধ হয়ে গেলো। এসবের জবাব দিয়ে হগ সাহেব জানালেন দোষ তাদের নয়, সরকারেরই। সরকার ট্রামগাড়িতে মাল বহন হবে বলেও তা করার ব্যবস্থা করেন নি। তাই তাদের সে রকম আয় হচ্ছিলো না, কাঁহাতক লোকসান সহ্য করা যায়? তাই তারা ট্রাম চলা বন্ধ করে দিলেন আর সরকারকে সঙ্গে সঙ্গে অনুরোধও করলেন গাড়ি, ঘোড়া মালপত্র সব যাতে কোন লোককে বা কোম্পানীকে বিক্রিও করে দেওয়া যায়।

মজার কথা হলো হগ সাহেব রিপোর্ট দিলেন বটে সাফাই গেয়ে, কিন্তু সে রিপোর্ট অনেকেই মানতে পারলেন না। অনেক কাগজে লেখা হলো জাস্টিস অব পীসরা নিজেদের দোষ ঢাকতে চাইছেন।

কিন্তু সে যাই হোক, কলকাতাবাসীদের দুর্ভাগ্যই যে অমন সুন্দর ট্রাম-গাড়ি বন্ধই হয়ে গেলো।

কিন্তু তাতে অবশ্য হতাশ হওয়ার কারণ ছিলো না।

কেন সে কথা বুঝতে পারছো?

আসলে কলকাতা তখন জাগছিলো। বাড়ছিলো তার জনসংখ্যা আর সমস্যা। আর তারই সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তার প্রয়োজনও।

তাই ট্রাম বন্ধ হলে কি হবে, মানুষ সোচ্চার হয়ে উঠলো ট্রাম বন্ধ হলে চলবে না, আমাদের জন্য গাড়ি চাইই।

সাধারণ কলকাতাবাসীরা তো এমন দাবী করতেই পারে। তারা এটা না হলে যাতায়াত করবে কেমন করে?

তাহলে শেষ পর্যন্ত কি হলো?

হ্যাঁ, এ প্রশ্ন তো স্বাভাবিক ভাবেই আসতে পারে।

আনন্দের কথা, কিছুকাল কলকাতায় ঘোড়ায় টানা ট্রামগাড়ি বন্ধ থাকলেও শেষ পর্যন্ত সে গাড়ি কলকাতাবাসীদের প্রয়োজন আর দাবীর ফলেই আবার চালু হয়—আর আজও তা সমানে চলেছে। আজ একশ বছরও এমন করে পার হয়েও গেছে।

এবার তাহলে চলো, দেখে নিই এই দ্বিতীয় পর্বের ট্রাম কি রকম ভাবে চলেছিলো, চালানোর ব্যবস্থাই বা করেছিলেন কারা।

হ্যাঁ, সেটা জানা দরকার এই কারণেই যে, এরপর এই ভাবেই ট্রামের বিবর্তন ঘটে গেলে আমরা পৌঁছে গেছি আজকের যুগে—বিদ্যুৎ শক্তিতে ট্রাম চালানোর যুগে।

এবার তাহলে দ্বিতীয় পর্বের ট্রামের ইতিহাস।

আমরা এবার কলকাতা শহরে ট্রাম চালানোর দ্বিতীয় পর্ব বা ধাপের দিকে এগিয়ে এসেছি। জাস্টিস অব পীসরা লোকসানের ধাক্কায় ট্রাম বন্ধ করে দিয়েছিলেন বলে সমালোচনার ঝড় চলেছিলো। তারা ঠিক করেও ফেলেছিলেন আর ট্রাম চালানোর ক্ষমতা তাদের নেই অতএব সব মালপত্র তারা বেচে দেবেন।

এ থেকে একটা কথা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো।

কথাটা হলো, দ্বিতীয় বারে যে ট্রাম কলকাতার বুকে চালানোর ব্যবস্থা করা হচ্ছিলো সেটা আর ওই জাস্টিস অব পীসরা করেন নি। তাহলে সেটা কারা করেছিলেন ?

হ্যাঁ, সেই কথাতেই এবারে আসছি আমরা।

নিশ্চয়ই আন্দাজ করতে পারছো জন্ম নিতে চলেছে কলকাতা ট্রামওয়েজ কোম্পানী।

কিন্তু অতো তাড়া দিলে চলবে না, ধীরে ধীরে এগোই চলো।

ইতিমধ্যে একটা মজার ব্যাপারও ঘটে গিয়েছিলো। সেটা হলো কলকাতা শহরটার দেখাদেখি মাদ্রাজ শহরেও ট্রাম চালানো আরম্ভ হয়েছিলো। আবার তা বন্ধ হয়েও যায়।

আশ্চর্যের কথা কি জানো ? কলকাতার মতই লোকসান। লোকসানের ধাক্কা সামলাতে না পেরে সেখানকার কর্তারাও সেটা বন্ধ করে দিতে বাধ্য হন। আবার এরপর অন্যান্য জায়গাতেও ট্রাম চালানোর কথা হয়েছিলো—যেমন বাঙ্গালোর শহরে। সে সেই ১৮৭৭ সালের কথা। বোম্বাই শহরেও ট্রাম চালানো হচ্ছিলো।

আশ্চর্যের কথাটা হলো, বোম্বাইর ট্রামে কিন্তু লোকসান হলো না। তা না হোক আমাদের আলোচনা কিন্তু বোম্বাইর ট্রাম নিয়ে নয়। আমরা দেখতে চাই দ্বিতীয় দফায় কলকাতায় কেমন করে আবার সেই ট্রামগাড়ি চলতে শুরু করেছিলো, তাই না ?

বেশ, তাহলে সেটাই দেখা যাক।

কলকাতা মিউনিসিপ্যালিটি কি করছিলো এবার ?

হ্যাঁ, এ প্রশ্ন করতে পারা যায় বটে। কারণ তাদের জাস্টিস অব পীসরাই তো প্রথম দফায় ট্রাম চালিয়েছিলেন। লোকসানের ধাক্কায় জাস্টিসরা তো ট্রাম বন্ধ করে দিলেন, কিন্তু ট্রামের অত টাকার মালপত্র, ঘোড়া, ট্রামের লাইন তার কি হলো ?

১৮৭৩ সালের ডিসেম্বর মাসে জাস্টিস অব পীসরা পাকাপাকি ভাবেই ঠিক করে ফেললেন যে সব গাড়ি ঘোড়া সুদ্ধু পুরো ট্রাম লাইনও এক কণাও লাভ না রেখে ম্যাক অ্যালিস্টার নামে এক সাহেবকে বিক্রি করবেন। সব

ব্যবস্থা প্রায় হয়ে গেলেও কিন্তু মতলবটা সেকালের বাংলাদেশের সরকার ভালো মনে করলেন না। তারা বললেন আরও ভাবনা চিন্তা করা চাই। অনেক টাকার ব্যাপার তো।

সরকারের কথামতো মিউনিসিপ্যালিটি আর সরাসরি সরঞ্জাম বিক্রী করতে পারলেন না। এর বদলে কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে দরপত্র আহ্বান করা হলো। যার দর বেশি হবে তাকেই এবার সব বিক্রি করে দেওয়া হবে ঠিক হলো।

তারপর কি হলো ?

হ্যাঁ, সেটাই এবার দেখা যাক এসো।

দরপত্র ঠিকই এসেছিলো। আসলে এসেছিলো দুটো দরপত্র। একটা তার মধ্যে বোম্বাই থেকে, দিয়েছিলেন মিঃ কেট্রিজ নামে একজন। তিনি দর দিয়েছিলেন ট্রামের লাইনের জন্য দুহাজার আর একহাজার টাকা প্রতি মাইল হিসেবে।

আর অন্য দরপত্রটা এসেছিলো লণ্ডন আর লিভারপুল শহর থেকে। সেটা দিয়েছিলেন দুজন। তাদের নাম ডিলুইন প্যারিশ আর রবিনসন সুটার।

প্রথম দরপত্র আসে ১৮৭৮ সালের ৮ই নভেম্বর আর দ্বিতীয়টা আসে ২০শে জানুয়ারী তারিখে।

প্যারিশ আর সুটারের দরপত্রে দেখা যায় যে কলকাতা মিউনিসিপ্যালিটি বেশ লাভ রেখেই সব কিছু সরঞ্জাম বিক্রি করতে পারবে। এতে প্রায় হাজার ত্রিশেক টাকাই লাভ হতে পারে দেখা গিয়েছিলো।

তাহলে কি প্যারিশ আর সুটারকেই শেষ পর্যন্ত সব বিক্রি করা হলো ?

হ্যাঁ, সেটাই এবার দেখা যাক।

দুটো দরপত্রই এবার পুরসভার কর্তাব্যক্তিদের সামনে পেশ করা হলো। তারা দরপত্র নিয়ে বিচার বিবেচনা করে শেষ পর্যন্ত ওই প্যারিশ আর সুটারকেই সব কিছু বিক্রি করে দেন।

প্রথম বারের ট্রাম এই ভাবেই বন্ধ হয়ে গেলে সব সরঞ্জামও বিক্রি হয়ে গেলো। কিন্তু এখানেই সব কিছু শেষ হয়নি।

এর মানে নিশ্চয়ই জানতে চাইছো ?

এর মানে হলো প্রথম বারের ট্রাম বন্ধ হয়ে গেলেও তোড়জোর শুরু হয়েছিলো দ্বিতীয় দফায় ট্রাম চালানোর। কলকাতার মানুষের জন্য সস্তার গাড়ি নিতান্তই প্রয়োজন হয়ে পড়েছিলো। কারণ কি বুঝতে পারছো ?

হ্যাঁ, কলকাতার লোকসংখ্যা যে বাড়ছিলো হু হু করে।

কলকাতার পরিবহন নিয়ে তখন অনেকেই ভাবনা চিন্তা শুরু করেছিলেন। এর মধ্যে তখন অনেক ব্যবসায়ীরাও ছিলেন। তারাও ভাবছিলেন কলকাতা শহরে পরিবহনের ব্যবস্থা করলে বেশ লাভের ব্যাপার হয়তো হয়ে উঠতে পারে। প্রথমে তারা সেই জাস্টিস অব পীসদের লোকসান দেয়া ট্রাম

নিয়েই মাথা ঘামাতে লাগলেন। সেই প্রথম ব্যবসায়ীদের মাথা ঘামানো, আজও যা সমানে চলেছে।

এবার তাহলে একটা জিনিস নিশ্চয়ই ঘটতে চলেছে বুঝতে পারছো?

হ্যাঁ, এবার জন্ম নিতে চলেছে আজকের সেই বিখ্যাত কলকাতা ট্রামওয়েজ কোম্পানী। এটা হলো এরই উপক্রমণিকা।

এই ১৮৭৮ সালেই বেশ কিছু ব্যবসায়ীর কাছ থেকে কলকাতা শহরে আবার ট্রাম চালাবার প্রস্তাব এসে গেলো। অনেকেই ট্রাম চালাতে খুব উৎসাহী তাদের আগ্রহ থেকেই বোঝা যাচ্ছিলো।

নানা ব্যবসায়ীর কাছ থেকে আনা বেশ কিছু প্রস্তাব নিয়ে বিচার বিবেচনা করতে লাগলেন কলকাতার পুরসভার কর্তাব্যক্তিরা।

কাদের প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য বলে মনে করা হলো?

হ্যাঁ, সেটাই এবার দেখতে পারি।

দেখা গেলো ট্রাম চালাবার সেই লাইন, গাড়ি আর বাকি সরঞ্জাম যাঁরা কিনে নিয়েছিলেন সেই প্যারিশ আর সুটার কোম্পানীও এদের মধ্যে একজন ছিলেন, তাদের দেওয়া প্রস্তাবটাই সবচেয়ে ভালো ছিলো বলে সেটাই মেনে নেওয়া হলো।

কলকাতা শহরে দ্বিতীয় দফায় ট্রাম চালাবার শুভ মুহূর্ত এবার এসে গেলো। প্যারিশ আর সুটারকেই সারা কলকাতা শহরে ট্রাম চালানোর অনুমতি দেওয়া হলো।

কাজে লেগে পড়লেন প্যারিশ আর সুটার কোম্পানী। কলকাতাকে তারা আবার ট্রামগাড়ি উপহার দিতে চলেছেন।

অনুমতি পেয়েই তারা প্রথমে যে কাজ করলেন, তা হলো ট্রাম চালাবার ব্যবস্থা করার জন্য একটা কোম্পানী খুলে ফেললেন—আর সেই কোম্পানীরই নামকরণ করলেন 'কলকাতা ট্রামওয়েজ কোম্পানী'। একশ বছর পার হওয়ার পরে আজ সেই বিলিতি ট্রাম কোম্পানী হয়ে গেছে সরকারের মালিকানায় জাতীয় সম্পত্তি, এ কাহিনী তো অনেকেরই জানা।

১৮৭৯ সাল এসে গেলো এইভাবেই। প্যারিশ আর সুটার কোম্পানী তাদের আগেই কিনে রাখা ট্রাম লাইন, গাড়ি আর বাকি সব সরঞ্জাম প্রতি মাইল চারহাজার পাউন্ড হিসেবে বিক্রী করে দিলেন কলকাতা ট্রামওয়েজ নামে গড়ে তোলা নতুন পরিবহন কোম্পানীকে।

দ্বিতীয়বারে ট্রাম চালানোর কাজ দ্রুত এগিয়ে চললো। এবার কলকাতা পুরসভা আর কলকাতা ট্রামওয়েজ কোম্পানীর মধ্যে একটা চুক্তিও সই করা হয়ে গেলো।

এই চুক্তির ফলে কি হলো?

সেটাই এবার দেখি এসো।

এই চুক্তির ফলে কলকাতা ট্রামওয়েজ কোম্পানীকে প্রথম দিকে কলকাতার বিশেষ বিশেষ অঞ্চল বা এলাকায় ট্রাম চালানোর অনুমতি দেওয়া হলো।

সেই অঞ্চল কি কি?

খুব স্বাভাবিক প্রশ্ন।

সেই এলাকা বা অঞ্চল হলো, শিয়ালদা স্টেশন থেকে সেই পুরনো পথে বৌবাজার পার হয়ে ডালহৌসী স্কোয়ার অর্থাৎ আজকের বি. বা. দী বাগ পর্যন্ত, চৌরঙ্গী রোড, ধর্মতলা রোড বরাবর, স্ট্র্যান্ড রোড, শ্যামবাজার এলাকা, ওয়েলেসলি স্ট্রীট এলাকা আর দক্ষিণে খিদিরপুর।

চুক্তিতে কলকাতা মিউনিসিপ্যালিটির পাওনা কি রকম?

সেটাও একটু দেখা যাক।

ট্রাম কোম্পানীকে অধিকার দেওয়া হয় সিঙ্গল আর ডবল লাইন পাতার। আর এইভাবে লাইন পাতার জন্য ভাড়া হিসেবে তাদের দিতে হবে সিঙ্গল লাইনের জন্য বছরে ২ হাজার টাকা আর ডবল লাইনের জন্য বছরে ৩ হাজার টাকা। এর সঙ্গে একটা শর্তও ছিলো। সেটা হলো, বাইশ বছর পরে এই এই ভাড়া আবার ১৯০১ সালে বেড়ে দাঁড়াবে ৩ হাজার আর ৪ হাজার টাকা। এছাড়াও আরও নানা রকম শর্ত ছিলো।

তাছাড়াও শর্ত ছিলো ১৯৩১ সালের মধ্যে বা তার পরে কলকাতা পুর-সভা ৭ বছর অন্তর সমস্ত ট্রাম কিনে নিতে পারবেন। অবশ্য মজার কথাটা হলো এরকম কিনে নেবার শর্ত থাকা সত্ত্বেও কিন্তু তারা ট্রাম কিনে নেননি। শেষ পর্যন্ত ১৯৬৭ সালে এর ভার নিয়ে নিয়েছিলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকার।

কিন্তু সেকথা যাক; দ্বিতীয় বারের ট্রাম কবে থেকে আবার কলকাতার রাস্তায় চলতে শুরু করলো তাই দেখা যাক।

ট্রাম লাইন পাতাই ছিলো সেই প্রথম বারের ট্রাম চালানোর জন্য, অতএব ট্রাম চালাতে অসুবিধা ছিলোনা। সেই শিয়ালদা-বৌবাজার লাইনেই আবার শুভ যাত্রা শুরু হল কলকাতার ট্রামের। এর মধ্যে ১৮৮০ সালের ১লা নভেম্বর কলকাতা ট্রামওয়েজ কোম্পানী কিন্তু একেবারে রেজিস্ট্রি করা হয়ে গিয়েছিলো আর হয়ে উঠেছিলো পাকাপোক্ত একটা সওদাগরী প্রতিষ্ঠান।

১৩ই নভেম্বর ১৮৮০।

হ্যাঁ, ওইদিনই আবার শিয়ালদা-বৌবাজার লাইনে দ্বিতীয়বারের ট্রাম যাত্রী নিয়ে চলতে শুরু করলো।

কলকাতার পরিবহনের ক্ষেত্রে সে এক শুভদিন নিশ্চয়ই।

কেন, একথা নিশ্চয়ই জানতে চাও?

তার কারণ সেদিন থেকে সেই যে শুরু হলো, ট্রামের সে যাত্রা আজও থামেনি—সমানে আজও অবধি চলেছে।

তবে এর মধ্যে একটা প্রশ্ন আছে বৈকি।

প্রশ্নটা কি ?

সেটা হলো, দ্বিতীয়বারের ওই ট্রামও ছিলো ঘোড়ায় টানা। তারপর পরিবর্তন আর বিবর্তনের অনেক ধারা পার হয়েই আজকের কলকাতায় চলেছে বিদ্যুতের ট্রামগাড়ি।

এরপর ট্রামের এলাকা বাড়তে লাগলো। বসানোও হলো নতুন নতুন আরও ট্রাম লাইন।

তবে প্রথম বারের মত সেরকম উত্তেজনা আর হৈ চৈ অবশ্য আর হলোনা। কলকাতার মানুষ অনেকটাই অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিলো।

তবে নিন্দুকেরা সমালোচনা করতে ছাড়েনি। অনেক কাগজে, যেমন 'সংবাদ প্রভাকরে' সরকারের নিন্দা করা হলো আবার কলকাতায় ট্রাম চালাতে দেওয়া হলো বলে। তাদের মত হলো এভাবে টাকা অপব্যয় করা কেন ?

শিয়ালদা-বৌবাজারের পর ট্রাম চললো শিয়ালদা-বৌবাজার-ডালহৌসী-হেয়ার স্ট্রীট লাইন বরাবর। সেটা হলো ১৯শে নভেম্বর ১৮৮০ থেকে।

এরপর থেকে আরও লাইন পাতা শুরু করলো ট্রাম কোম্পানী।

কিভাবে কোথায় লাইন পাতা হলো দেখা যাক এবার।

চৌরঙ্গীতে ১৮৮১ সালের নভেম্বর মাসে
ধর্মতলায় ১৮৮২ সালের মার্চ মাসে
স্ট্র্যান্ড রোডে ১৮৮২ সালের জুন মাসে
শ্যামবাজার ১৮৮২ সালের নভেম্বর মাসে
খিদিরপুরে ১৮৮৩ সালের ডিসেম্বর মাসে।

১৯০৪ সাল থেকে ক' বছরের মধ্যে লাইন আরও বাড়লো। এসে গেলো টালিগঞ্জ, বেলগাছিয়া, হ্যারিসন রোড, সার্কুলার রোড ইত্যাদি এলাকায় ট্রাম লাইন।

১৯০১ সাল পর্যন্ত কিন্তু ঘোড়ায় টানা ট্রামের সময় পর্যন্ত ছিলো মোটে একখানা করে গাড়ি। একদিকে পাঁচটা করে দুদিকে থাকতো দশটা করে দরজা। দুদিক দিয়েই নামা ওঠা করা যেতো আগেই দেখেছো।

ট্রাম লাইন কি আজকের মতই ছিলো ?

হ্যাঁ, এ প্রশ্নটা করা চলতে পারে বটে।

এর উত্তর হলো, ঠিক তা নয়। প্রথম দিকে ট্রাম লাইন চওড়ায় ছিলো ৩ ফুট ৩/৮ ইঞ্চি। ১৯০২ সালে ট্রাম কোম্পানী সব লাইন বদলে করে ফেলে ৪ ফুট ৮½ ইঞ্চি। এটা কাজের সুবিধার জন্য। গাড়িও চওড়া হয়েছিলো বলেই এই ব্যবস্থা করা হয়।

তখনকার দিনেও কি আজকের মতই রাস্তার কিছু তফাতে ট্রাম স্টপ বা ওঠানামারও জায়গা ছিলো ?

সেটাই এবার দেখি এসো।

না, গোড়ায় কিন্তু নির্দিষ্ট কোন ট্রাম স্টপ আদৌ ছিলোনা। যাত্রীরা যে যেমন খুশি ট্রাম থামিয়ে নামা ওঠা করতেন। ১৮০৯ সালে ট্রাম কোম্পানী সর্বপ্রথম স্টপের ব্যবস্থা করলেন। আগে যেখানে সব যাত্রীরা ওঠানামা করতেন তাকে স্টেশনই বলতো লোকে। ভারি মজার কথা।

আবার ঘোড়া বদলেরও স্টেশন ছিলো। সেটা থাকতো মাইল খানেক অন্তর, অবশ্য বড় বড় রাস্তাতেই। সেখানে থাকতো ঘোড়ার আস্তাবল। যেমন এই ধরনের আস্তাবল ছিলো চিৎপুর লাইনের সক স্ট্রীট এলাকায়, লালবাজারে, ডালহৌসী স্কোয়ারে, এসপ্লানেডে এইসব জায়গায়।

ট্রাম কোম্পানীর সব ঘোড়া কোথায় থাকতো ?

হ্যাঁ, কথাটা জানা যেতে পারে। ঘোড়ার সংখ্যাও তো নেহাত কম নয়—প্রায় হাজার খানেক ঘোড়া। দামী অস্ট্রেলিয়ান ওয়েলার ঘোড়া।

এসব ঘোড়াকে রাখা হতো ট্রাম কোম্পানীর বেশ কয়েকটা বড় বড় আস্তাবলেই।

সেগুলো কোথায় ছিলো ?

সেগুলো ছিলো চিৎপুর, শিয়ালদা, ভবানীপুর, খিদিরপুর ইত্যাদি জায়গায়।

ট্রাম কোম্পানীও কিন্তু আস্তে আস্তে বড় হয়ে উঠছিলো। বাড়ছিলো তার কর্মচারিদেরও সংখ্যা। ১৮৯০ সালে কর্মচারিদের সংখ্যা নেহাত কম ছিলো না—প্রায় আড়াই হাজারের কাছাকাছি।

কলকাতা শহরে দ্বিতীয়বারের ট্রাম—হ্যাঁ, ঘোড়ায় টানা সেই ট্রাম গাড়ি বেশ বহাল তবিয়তেই গড়গড় করে এগিয়ে চলেছিলো। ট্রাম চালাতে গিয়ে অবশ্য ট্রাম কোম্পানীকেও জাস্টিস অব পীসদের মতই ঢের অসুবিধেও সহ্য করতে হচ্ছিলো।

সেগুলো কি ?

এর মধ্যে একটা তো আগেই আমরা দেখেছি—গরমের দেশ বলে ঘোড়াদের প্রচণ্ড কষ্ট হতো, অনেকে সর্দিগর্মীতেও মারা পড়তো। এতে কোম্পানীর ভালো রকম ক্ষতিই হয়ে যেতো। এছাড়াও ছোটখাট দুর্ঘটনাও লেগে থাকতো।

তাহলে কি বলতে চাইছি ?

হ্যাঁ, এ প্রশ্ন অতি স্বাভাবিক। আমরা বলতে চাইছি, আস্তে আস্তে এবার ঘোড়ায় টানা ট্রাম চালানো কতোদূর টেনে নেওয়া সম্ভব তাই নিয়েই শুরু হয়েছিলো চিন্তা ভাবনা।

ট্রামের যুগ বদলে যেতে চলেছে।

হ্যাঁ, এটা তারই মুখবন্ধ নিশ্চয়ই আন্দাজ করতে পেরেছো ? এবার আসতে চলেছে ঘোড়ার টানা ট্রামের বদলি কিছুই।

সেটা কি ?

এবার সেটাই দেখতে পারি।

ঘোড়ায় টানা ট্রাম অনেক সমস্যার কারণ হয়ে উঠেছিলো এতো আগেই দেখা গেছে। তাই কলকাতা ট্রামওয়েজ কোম্পানীর সকলে ভাবছিলেন ঘোড়ার বদলে শক্তি হিসেবে আর কি ব্যবহার করতে পারা যায়।

কিন্তু তখন বিদ্যুতের এরকম অঢেল ব্যবহার তো হয়নি।

তাহলে ? শক্তি হিসেবে তবে কিসের ব্যবহার হলো ?

বিদ্যুতের আগের কথাটা একবার ভেবে নাও। হ্যাঁ, বাষ্পীয় শক্তি।

এই বাষ্পীয় শক্তিই এবার কাজে লাগিয়ে স্টীম ইঞ্জিনের সাহায্যে ট্রাম চালাবার ব্যবস্থা হয়ে গেলো।

সরকার অনেক ভেবেচিন্তে কলকাতা ট্রামওয়েজ কোম্পানীকে তাদের আবেদন মত কলকাতা শহরে স্টীম ইঞ্জিন দিয়ে ট্রাম চালাবার চেষ্টা করার অনুমতি দান করলেন।

এবার এক নতুন যুগেরই সূচনা হতে চলেছে।

ঘোড়ার ট্রামের বদলে যান্ত্রিক শক্তিতে ট্রাম চালানো !

এই ভাবেই সব ব্যবস্থা করা হয়ে গেলে ১৮৮২ সালের মে মাসে যাত্রা শুরু হলো স্টীম ইঞ্জিনে টানা ট্রাম গাড়ির। প্রথম এই স্টীম ইঞ্জিনের ট্রামগাড়ি তার জয়যাত্রা শুরু করলো চৌরঙ্গীর লাইন বরাবর।

স্টীম ইঞ্জিনের ট্রামগাড়ি উৎসাহ উদ্দীপনাও জাগিয়ে তুললো। তবে ঝামেলাও যে দেখা দেয়নি তা নয়। ঝামেলা হলো, বেশ কিছু দুর্ঘটনাও মাঝে মাঝে ঘটতে লাগলো। অবশ্য তেমন মারাত্মক ধরনের নয়, বা মানুষজন আজকের কলকাতার মত মারাও পড়েনি।

বছর খানেক এইভাবেই চললো। সকলের চাহিদা মেটাতেই এই ব্যবস্থা নিয়েছিলো কলকাতার ট্রাম কোম্পানী।

চৌরঙ্গী অঞ্চলে স্টীম ইঞ্জিনের ট্রাম চালানো হয় কেন জানো ? এটা করা হয় দক্ষিণ কলকাতার কালিঘাটের যাত্রীদের সুবিধার জন্য। পরে অবশ্য খিদিরপুর অঞ্চলেও এ ট্রাম চললো।

এই স্টীম ইঞ্জিনে টানা ট্রামগাড়িকে লোকে কি বলতো জানো ? বলতো কলের ট্রাম। ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে কলের ট্রাম লাইন ধরে ধিকিধিকি এগিয়ে চলতো—সে এক ভারি মজারই দৃশ্য। আজকের মানুষের কাছে সেটা শুধু কল্পনারই ব্যাপার। হয়তো বা হাস্যকরও।

কিন্তু সেদিনের—সেই ১৮৮২ সালের কথা একটু ভেবে নাও। কলকাতার যানবাহনের ক্ষেত্রে এটা তো সবেমাত্র গড়ে ওঠার যুগ মাত্র।

বিবর্তনের সেই শুরু।

এই বাষ্পীয় শক্তিতে কলকাতার ট্রাম চলেছিলো প্রায় এগারো মাসের মত—

১৮৮৩ সালের এপ্রিল পর্যন্ত। কিন্তু সারা কলকাতা শহরটায় তা আর হয়নি।

বাষ্পীয় শক্তিতে এই ট্রাম চালানোর ব্যবস্থা খুব বেশিদিন চললো না দেখা যাচ্ছে।

কিন্তু কেন, এ প্রশ্ন স্বাভাবিক।

এবার সেই কারণ খতিয়ে দেখা যাক।

আসলে অসুবিধা ছিলো অনেক।

তার মধ্যে, শব্দ, ধোঁয়া আর খরচের সমস্যাই প্রধান। এ যেন শহরের বুকে রেলগাড়িই।

তাহলে এর পরিণতি কি হলো ?

এবার সেটা দেখা চলতে পারে।

আসলে ঘোড়ায় টানা ট্রাম আর বাষ্পীয় শক্তি অর্থাৎ স্টীম ইঞ্জিনের যুগও শেষ হতে চলেছিলো—এর পরিবর্তে আসছিলো আধুনিক যুগের প্রধান শক্তি সেই বৈদ্যুতিক শক্তি।

তাহলে এবার দেখা যাক বৈদ্যুতিক ট্রামগাড়ি কবে আর কিভাবে চলেছিলো।

● বৈদ্যুতিক ট্রাম

বৈদ্যুতিক ট্রামই হলো আজকের আধুনিক ট্রাম। এই বৈদ্যুতিক ট্রাম চালানোর প্রস্তাব কিন্তু কলকাতা ট্রামওয়েজ কোম্পানীর মাথায় প্রথমে খেলেনি।

তাহলে কার মাথায় একথার উদয় হয়েছিলো ?

সেটাই এবার দেখা যাক এসো।

ইংরেজ রাজত্বে বহু বড় বড় সওদাগরী কোম্পানী দেশে গড়ে উঠেছিলো। এই রকমই এক বিখ্যাত কোম্পানী কিলবার্ন কোম্পানীই প্রথম কলকাতা শহরের বুকে ঘোড়া বা স্টীম ইঞ্জিনের বদলে বিদ্যুৎ শক্তিতে ট্রাম চালাবার জন্য সরকারের কাছে অনুমতি চেয়ে দরখাস্ত করেছিলো।

সরকার ট্রাম কোম্পানী আর কিলবার্নের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে ট্রাম কোম্পানীর সঙ্গে কিলবার্নের চুক্তির কথা বলে রাজি হয়ে গেলেন। এরপর ট্রামওয়েজ কোম্পানীর সঙ্গে কিলবার্নের চুক্তিও হয়ে গেলো। কলকাতায় বিদ্যুৎ শক্তিতে ট্রাম চালানোয় আর কোন বাধা রইলো না।

এ ব্যাপারে পুরসভারও হাত ছিলো। হাত থাকার কারণ, কলকাতা শহরের পথঘাটের দায়িত্ব যে তাদেরই ছিলো।

১৮৯৮ সালে ট্রামওয়েজ কোম্পানী কলকাতার পুরসভাকে জানায় বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা না করলে ট্রাম চালানো বন্ধ করে দিতে হতে পারে। পুরসভা সব কথা ভেবেচিন্তে ট্রাম কোম্পানীকে ১৯০১ সালের ১লা জানুয়ারী

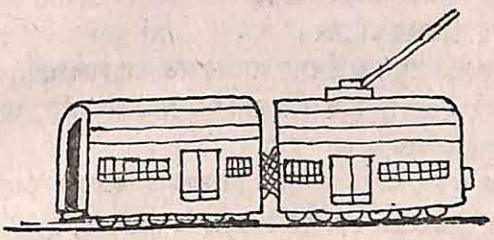
৩০ বছরের জন্য কলকাতায় বৈদ্যুতিক ট্রাম চালানোর অনুমতি দিয়ে দিলেন।

আরও অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে বেশ কিছু চুক্তির বয়ানও তৈরি হয়ে গেলো। কলকাতা লাভ করতে চললো তার প্রথম বৈদ্যুতিক ট্রাম।

প্রথম কবে তাহলে এই বৈদ্যুতিক ট্রামগাড়ি চললো ?

সেটাই দেখা যাক এবারে।

কলকাতা শহরে প্রথম বিদ্যুতে ট্রাম চললো ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে মার্চ তারিখে খিদিরপুরের লাইনে।



বৈদ্যুতিক ট্রাম

তারপর ধীরে ধীরে তা চালু হয়ে গেলো কলকাতার আরও নানা অঞ্চলে।

এজন্য ট্রামওয়েজ কোম্পানীকে খরচও করতে হলো অনেক। ট্রামগাড়ি বানাতে হলো নতুন করে—ঘোড়ায় টানা গাড়িতে তো চলতে পারে না। আনতে হলো বিদেশ থেকে নতুন ধরনের ইঞ্জিন। শিক্ষিত ড্রাইভারকেও নিয়োগ করতে হলো—লাগাতে হলো বহু দীর্ঘ ট্রামের তার আর পোস্ট বা খুঁটি।

১৯০২ সালের মধ্যে বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠলো কলকাতার ট্রামগাড়ি। যাত্রী সংখ্যাও বাড়তে লাগলো হুহু করে—কলকাতার লোকসংখ্যাও যে তখন থেকে ক্রমাগত বেড়েই চলেছিলো।

এই ১৯০২ সালের মধ্যেই সবকটা পুরনো আমলের এলাকার লাইনে ঘোড়ার ট্রাম বন্ধ হয়ে গেলো। সব জায়গাতেই এবারে যে এসে গিয়েছিলো সেই বৈদ্যুতিক ট্রাম।

বিদ্যুতে টানা ট্রামের সুবিধা যে অনেকটাই ছিলো। খিদিরপুরের পরেই চলেছিলো কালিঘাট লাইন বা চৌরঙ্গী লাইনের ট্রাম। সেও ওই ১৯০২ সালের একেবারে গোড়াতেই। ১৯০২ সালের শেষ নাগাদ সব লাইনেই এসে গিয়েছিলো বৈদ্যুতিক ট্রাম সে কথা তো আগেই দেখা গেছে।

কোম্পানীরও তখন খুব রমরমা—ঢের লাভ হচ্ছিল ট্রামওয়েজ কোম্পানীর। তারা তাই এলাকা বাড়াতে লাগলেন। তারা তো ব্যবসাদার,

তাই লাভের কথাটাই আগে চিন্তা করছিলেন আর তাতে লাভ হচ্ছিলো সঙ্গে সঙ্গে কলকাতার মানুষদেরও।

হ্যাঁ, আজ পর্যন্ত যত যানবাহন কলকাতায় চলেছে নিঃসন্দেহে এই ট্রামই তাদের মধ্যে সবার চেয়েই সস্তা।

১৯০৩ সাল থেকে ১৯০৯ সালের মধ্যে তাই ট্রাম চালু হয়ে গেলো এক এক করে টালিগঞ্জ, বাগবাজার, বেহালা, আলিপুর, হ্যারিসন রোড, বেলগাছিয়াতে—একেবারে সারা শহর জুড়ে।

আরও অনেক পরে চালু হয় রাজাবাজার থেকে গ্যালিফ স্ট্রীট—২রা মার্চ ১৯৪১ সালে, হাওড়া ব্রীজে ১৯৪৩ এর ১লা ফেব্রুয়ারী আর গড়িয়াহাট ১৯৪৩ এর ৮ই নভেম্বর তারিখে।

কলকাতা শহর তখন আর সেই আগের মত গোবিন্দপুর, সুতানুটি আর কলকাতা মাত্র নেই। বেড়েছে তার লোক সংখ্যা, ঘর বাড়ি আর পথ। আর তারই সঙ্গে পাল্লা দিয়ে অঢেল সমস্যা।

হ্যাঁ, সেই অঢেল সমস্যারই একটা নিঃসন্দেহে ছিলো পরিবহন সমস্যা।

কলকাতা ট্রামওয়েজ কোম্পানী বৈদ্যুতিক ট্রাম চালু করে সে সমস্যার সমাধানে প্রচুর সাহায্য করলেন সন্দেহ ছিলোনা।

কলকাতার পরিবহনে সমস্যা তখন থেকেই বাড়তে শুরু করেছিলো। আজও যার সমাধান সম্ভব হয় নি।

চমৎকার কাজই করে চললেন কলকাতা ট্রামওয়েজ কোম্পানী। ঘোড়ার ট্রাম উঠে যাওয়ায় এবার তারা বানিয়ে ফেললেন বৈদ্যুতিক ট্রামগাড়ি রাখার ডিপো। গড়ে উঠলো কালিঘাট, শ্যামবাজার, খিদিরপুর, শিয়ালদার ট্রাম ডিপো। তৈরি হলো ট্রাম মেরামতেরও কারখানা। ট্রামগাড়িরও রূপ বদলাতে শুরু করলো—ফার্স্ট ক্লাস আর সেকেণ্ড ক্লাসের চেহারাও বদলে গেলো। ফার্স্ট ক্লাসে এলো গদী মোড়া সিট আর পাখা। যাত্রীদের আরাম চাই তো।

প্রথম যুগের সেই ট্রামগাড়ির সঙ্গে আজকের আধুনিক ট্রামগাড়ির কোন রকম তফাৎ ছিলো কি?

হ্যাঁ, কিছুটা ছিলো বৈকি প্রথম যুগের বৈদ্যুতিক ট্রামগাড়ির সামনে পিছনে এই দুই প্রান্তেই থাকতো দরজা। তাই দিয়েই ওঠা নামা করা চলতো।

ট্রামগাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে ড্রাইভার ট্রাম চালাতো, ঠিক আজকের মতই ব্যবস্থা ছিলো। মাঝে মাঝে ড্রাইভার টিং টিং করে ঘণ্টা বাজিয়ে আওয়াজ তুলতো। এ দৃশ্য আজকের কলকাতাতেও চোখে পড়ে।

ট্রামগাড়িতে চড়তো কারা?

ট্রামগাড়িই ছিলো সে কালের সবচেয়ে সহজ আর সস্তা ভাড়ার গাড়ি।

ছিলো বলছি কেন, আজও তো তাই আছে। পয়সাওয়ালা মানুষই হোক আর গরীব মানুষই হোক ট্রামই হলো সকলের বাহন। অনেক নামী দামী মানুষও দরকার মত ট্রামে চড়েছেন।

কলকাতা শহরে এবার ট্রাম জাঁকিয়ে বসেছিলো। ঘোড়ার গাড়ি বা স্টীমের ট্রামে যে সমস্যা তা আর ছিলোনা। তখন তো আর আজকের মত লোড শেডিংয়ের ঝামেলা দেখা দেয়নি। ট্রাম কোম্পানীকে বিদ্যুৎ সরবরাহ করতো কলকাতা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানী। ট্রামওয়েজের নিজেরও কিছু ব্যবস্থা আস্তে আস্তে গড়ে উঠেছিলো।

ট্রাম কোম্পানীই কলকাতা আর হাওড়ায় গড়ে তুলেছিলো শহরের সবচেয়ে বড় পরিবহন ব্যবস্থা.। সারা শহরের মানুষ ট্রামের উপর দারুন ভাবে নির্ভর করতে শুরু করেছিলো। ট্রাম কোম্পানী তাই যাত্রীদের সুখ সুবিধার দিকে নজর দিতে শুরুও করেছিলো। তারা নানা সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করেছিলো।

কি রকম ব্যবস্থা ?

হ্যাঁ, তাই এবার দেখা যাক।

দুপুরের জন্য সস্তায় ভাড়া থাকতো ট্রামের। তাছাড়াও ছিলো ট্রান্সফার টিকিট। ট্রান্সফার টিকিটে এক জায়গা থেকে ট্রামে টিকিট কেটে অন্য রুট বা লাইনের ট্রামে চাপা চলতো, নতুন করে টিকিট কাটতে হতো না। তাছাড়াও থাকতো 'অলডে টিকিট'। এই টিকিটে সারাদিন ট্রামে সস্তায় ঘোড়া যেতো। আর ছিলো 'মাসিক টিকিট'। সেটা কোন বিশেষ রুট বা সব রুট মিলিয়ে পাওয়া যেতো। 'অলডে টিকিটে'র দাম ছিলো মাত্র ৬ আনা।

এসবের মধ্যে কিছু সুবিধে আজও আছে। যেমন মাসিক টিকিট, অলডে টিকিট। দাম অবশ্য সেদিনের তুলনায় ঢের বেশি—কিন্তু সেটা তো স্বাভাবিক।

কলকাতার মানুষ ট্রামকে করে নিয়েছিলো একান্ত আপনার।

ট্রাম কোম্পানীও তাই জনসাধারণের স্নেহ, প্রীতি আর সহযোগিতা নিয়ে একশ বছর, একটা শতাব্দী পার হয়ে এসেছে। শতবর্ষের বেশি কলকাতা শহরের বুকে শোনা গেছে ট্রামের চাকার আওয়াজ। সে আওয়াজ আজও হয়ে চলেছে। মাঝে মাঝে শোনা গেছে ট্রাম বন্ধ করে দেওয়া হবে, কেননা ট্রামই রাস্তার যানবাহনের দ্রুত গতিতে বাধা সৃষ্টি করে।

হয়তো কথাটা ঠিক। তবুও ট্রাম মানুষের মনে চিরকালের মতই তার ঠাঁই করে নিয়েছিলো। একে তাই কেড়ে নেওয়া যাবে না। ট্রাম তাই বহাল তবিয়তেই চলেছে। মাত্র ত্রিশ একত্রিশ মাইল দীর্ঘ ট্রাম লাইন আরও বেড়েছে। এখন ট্রাম লাইনের মোট দৈর্ঘ্য ৬২ কিলোমিটার। ট্রাম লাইন পাতা হবে লবণ হ্রদ পর্যন্তও। ট্রাম গরীব মানুষের বন্ধু, তাকে কেড়ে নেওয়া যাবে

না। মোট ট্রাম গাড়ি রোজ যা চলে, তাহলো প্রায় ৩৫০ খানা। পুরনো কিছু লাইন আবার বন্ধ করে দরকার মত নতুন লাইনও পাতা হয়েছে। যেমন মেট্রো রেলের কাজের জন্য ভবানীপুর থেকে এসপ্লানেডের ট্রাম চালানো হয় আলিপুর লাইনে আর ১২ এ বিড়লা প্লানেটোরিয়াম পর্যন্ত ধর্মতলা হয়ে নতুন ট্রামও চালু হয়েছে। বৌবাজারের ট্রাম বন্ধ হয়ে গেছে।

আবার নতুন লাইনও চালু হয়েছে, এসপ্লানেড থেকে জোকা আর এসপ্লানেড থেকে বিধাননগর।

কত মানুষ রোজ ট্রামে চড়ে জানো?

হ্যাঁ, আজকেরই কথা বলছি। আজকের শহর কলকাতায় দৈনিক গড়ে প্রায় দশ লক্ষ মানুষ ট্রামে চড়ে যাতায়াত করে থাকেন। এ এক বিরাট ব্যাপার, যাকে বলা যায় কর্ম যজ্ঞ। কলকাতা শহরে আজ রয়েছে প্রায় পাঁচশ'র মত ট্রাম—আর সেই অনুপাতে তার হাজার হাজার কর্মচারি। এই ট্রামকে বাঁচিয়ে রাখতে তাদের পরিশ্রমের সীমা পরিসীমা নেই। মাঝে মাঝে তাই, বিশেষ করে বর্ষা বাদলের দিনে ট্রাম বন্ধ হলে মানুষের দুর্গতির সীমা পরিসীমা থাকে না। আমরা সমালোচনাও করি বৈকি। ট্রাম তো লাইন বরাবর চলে—তাই এই অসুবিধা হলে আর উপায় কি? ট্রাম লাইন ঘসে চকচকে রাখার জন্যও এক রকম ট্রাম আছে, তাছাড়াও আছে জল দেওয়ার জন্য ট্রাম।

তবুও আশ্চর্যের কথা, এতো যাত্রী থাকলেও শোনা গেছে ট্রাম চালিয়ে অঢেল নাকি লোকসান হয়েছে কোম্পানীর।

এই রকম নানা কারণে শেষ পর্যন্ত ট্রাম কোম্পানীর পরিচালনার দায়িত্ব নিজের হাতে নিয়ে নিয়েছিলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকার। সেটা ১৯৬৭ সালে।

তারপর?

হ্যাঁ, তারপর পশ্চিমবঙ্গ সরকার নানা দীর্ঘ আলাপ আলোচনার পর সরকারের সহায়তায় ব্রিটিশ মালিকানার ট্রাম কোম্পানীকে পুরোপুরি জাতীয়করণ করে নিলেন। হ্যাঁ, এর জন্য প্রচুর টাকা দিতে হয়েছিলো ক্ষতিপূরণ বা দাম হিসেবে। সে টাকা ২ কোটির কিছু বেশিই। ট্রাম কোম্পানী জাতীয়করণ হয় কবে? ৮ই নভেম্বর ১৯৭৬ সালে। এইতো সেদিনেরই কথা।

ট্রাম গাড়ি শুধু কলকাতাতেই নয়, পৃথিবীর বহু দেশেই হয়ে উঠেছিলো দারুণ জনপ্রিয়। লন্ডন শহরেও ছিলো ট্রাম। ছিলো বার্লিন, হামবুর্গ, আর এই রকম নানা শহরেও।

কিন্তু দঃুখের কথা কি জানো?

দুঃখের কথা হলো, ওই সব শহরে ধীরগতি যান হিসেবে ট্রাম তুলেও দেওয়া হয়।

অবশ্য আনন্দের কথাও আছে।

সেটা হলো, খোদ লন্ডন শহরেই আবার শোনা গেছে ফিরে আসছে ট্রাম।

ট্রাম চালাতে খরচ সবচেয়ে কম, তাই।

কিন্তু ট্রামকে কলকাতা শহরে চলতে দিয়ে আমাদের একটু অন্য দিকে তাকানোর সময় এসেছে।

কি বলতে চাই বুঝেছো ?

হ্যাঁ, পরিবহনের ব্যবস্থায় আরও পরিবর্তন আসছিলো। আবিষ্কার হয়ে গিয়েছিলো ততদিনে মোটর গাড়ি। এসেছিলো বাসের দিন।

কলকাতাও তাই পিছিয়ে থাকতে পারে নি। সেটা তার প্রয়োজনেরই তাগিদে।

এবার ট্রাম গাড়ি ছেড়ে তাই সামনের দিকেই তাকাই এসো। প্রবেশ করি এবার নতুন যুগে।

● ছয় ●

কলকাতায় মোটর গাড়ি, ট্যাক্সি ও বাস

● মোটর গাড়ি এলো

কলকাতা শহর বেড়ে উঠেছে, বাড়ছে লোক সংখ্যা। নতুন করে তাই ভাবতেও হচ্ছিলো পরিবহন সমস্যার কথা। আরও নতুন নতুন কোন ব্যবস্থা চাই।

পালকি, ঘোড়ার গাড়ির আর ঘোড়ায় টানা ট্রামের যুগ শেষ হয়ে কলকাতা ইতিমধ্যে প্রবেশ করেছিলো যান্ত্রিক যুগে—এসে গিয়েছিলো বাষ্পীয় শক্তিতে টানা ট্রাম গাড়ি।

তারপর ?

তারপর বাষ্পীয় শক্তিও পুরনো হয়ে চালু হয় বৈদ্যুতিক শক্তির ব্যবহার। কলকাতা শহরটায় চলতে শুরু করেছিলো বৈদ্যুতিক ট্রাম।

এর মানে নিশ্চয়ই বুঝেছো ?

হ্যাঁ, কলকাতা শহরের পরিবহন কিছুটা আধুনিক রূপ পেয়েছিলো।

কিন্তু পৃথিবী থেমে থাকেনি—সারা পৃথিবীর উন্নত দেশগুলো অনবরত চেষ্টা করে চলেছিলো আরও উন্নত মানের যানবাহন, আরও দ্রুত গতি যান তৈরি করতে।

উনিশ শতকের প্রায় শেষ নাগাদ একজন জার্মান ইঞ্জিনিয়ার তার প্রচেষ্টায় সফল হলেন। তিনি আবিষ্কার করলেন আজকের সেই মোটর গাড়ি। সেই

জার্মান ইঞ্জিনিয়ারের নাম ডেমলার। ১৮৮৬ সালে তিনিই আবিষ্কার করলেন মোটর গাড়ি।

সত্যিই দারুন আবিষ্কার। এই চারচাকার পেট্রোলের গাড়ি আবিষ্কারের ফলে পরিবহন বহু যুগই এগিয়ে এলো। এখন যে কোন পথে দ্রুত বেগে চলার ক্ষেত্রে আর বাধা রইলো না। আমেরিকায় হেনরী ফোর্ডও গাড়ি নিয়ে অনেক কিছু নতুন জিনিস করলেন। সারা দুনিয়ায় হৈ হৈ পড়ে গেলো।

সত্যিই বিংশ শতাব্দী শুরু হওয়ার মুখে দুনিয়া প্রায় বদলে গেলো।

কলকাতা শহরের কি বলো?

হ্যাঁ, প্রশ্ন করতে পারা যায় নিশ্চয়ই। সেটাই এবার দেখি এসো।

কলকাতা শহরও পিছিয়ে থাকেনি।

কলকাতা শহরেও দেখা গেলো সেই মোটর গাড়ি—এই আবিষ্কারের বছর দশেক পরে। তখনকার গাড়ি আজকের মত অবশ্যই ছিলো না।

মোটর গাড়ি আস্তে আস্তে বাড়তে লাগলো। ইংরেজ রাজপুরুষ আর এদেশের বহু পয়সাওয়ালা মানুষও গাড়ি কিনে কলকাতার রাস্তায় ঘুরতে লাগলেন। কিন্তু তারা সব পয়সাওয়ালা ধনী মানুষ।

তাহলে, সাধারণ মানুষের কি হলো?

মোটর গাড়ি চড়ার মত বা কেনার সামর্থ্য তাদের তো ছিলোনা। তাহলে সাধারণ যাত্রীবহনের ব্যবস্থা কেমন বদলে গেলো মোটর গাড়ি আবিষ্কার হওয়ায়?

চমৎকার প্রশ্ন। এটাই এবার আমরা দেখবো মোটর গাড়ি আবিষ্কারে সাধারণ মানুষের কি সমস্যার সমাধান হলো—অর্থাৎ পরিবহনের কি সুবিধা হলো।

হ্যাঁ, সমস্যার সমাধান কিছু হয়েছিলো বৈকি। কিন্তু সে কথার আগে একটু দেখে নিলে মন্দ হয়না মোটর গাড়ি কলকাতায় কেমন উত্তেজনা সৃষ্টি করেছিলো।

সারা ভারতবর্ষ জুড়ে সে সময় এক নতুন উন্মাদনা শুরু হয়েছিলো। কেন তা জানো কি? স্বদেশী আন্দোলনের শুরু হয়েছিলো ঠিক তখনই, তাই।

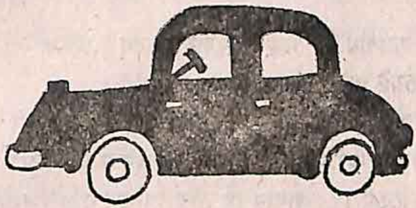
১৯০৩ কি ১৯০৪ সালেই কলকাতা শহরে প্রথম মোটর গাড়ি আমদানি হয়েছিলো—তাও দুএকখানাই মাত্র। ব্যবসাদাররা মোটর গাড়ির কারবার তখনও সুরু করেন নি। ১৯০৫ সালের কাছাকাছি কাগজে মোটরের বিজ্ঞাপন দুএকটা বেরোতে শুরু করেছিলো। ১৯১৪ সালের মধ্যে সেটার সংখ্যা অবশ্য বাড়ে। সে সময়টা আবার প্রথম মহাযুদ্ধেরই সময়। মাল পরিবহনের ব্যাপারে কিন্তু লরী বা ট্রাক বা পাবলিক বাস তখনও এসে পৌঁছয়নি। এসব চালু হয় আরও পরে, প্রথম মহাযুদ্ধ শেষ হলে সেই ১৯২০ সাল নাগাদ।

কিন্তু আগে মোটর গাড়ির ব্যাপারটাই দেখা যাক।

মোটর গাড়ি চালু হলে কি ধরনের বিজ্ঞাপন কাগজে দেখতে পাওয়া যেতো ?

বিজ্ঞাপনের দুচারটে উদাহরণ লক্ষ্য করলেই তা বোঝা যাবে।

যেমন ১৯০৫ সালে কাগজে বের হয়ঃ



প্রথম যুগের মোটর গাড়ি

"রোভার গাড়ি। একেবারে নতুন গাড়ি। ৮ অশ্বশক্তি।
এক সিলিণ্ডার। মূল্য ৩৬০০ টাকা।"

১৯০৬ সালে দেখা গেলঃ

"বিখ্যাত ১০-১২ অশ্বশক্তির আর্গিল টনো। মূল্য ৬০০০ টাকা।
পাশ দরজাঃ ৬৫০০ টাকা।"

১৯০৭ সালের বিজ্ঞাপনঃ

"ফ্রান্সের অতি বিখ্যাত
চেনার্ড-ওয়াকার, রেণো, পুজিও আর এফ. এম. সি. মোটর গাড়ি
স্ট্যান্ড ৪ লেডি মিণ্টো
মোটর গাড়ির প্রদর্শনী
একমাত্র বিক্রয়ের এজেন্টঃ ফ্রেঞ্চ মোটর কার অ্যান্ড ইলেকট্রিক কোং।"

১৯০৭ সালে কলকাতায় এইসব মোটর গাড়ির এক একজিবিশনও হয়। ভারতবর্ষে সেই প্রথম মোটর গাড়ির একজিবিশন। নাম লেডি মিণ্টো ফিট মোটর গাড়ি প্রদর্শনী। খুবই ভিড় হয় তাতে।

১৯০৮ সালে চোখে পড়লো সকলের এই বিজ্ঞাপনঃ

"ওয়েলসলি মোটর গাড়ি
স্টুয়ার্ট অ্যান্ড কোং. কোচ প্রস্তুত কারক, কলিকাতা
"১৫ অশ্বশক্তির মোটর গাড়ি
ট্যালবট ল্যাণ্ডোলেট
ডাইকসের প্রস্তুত বডি।"
"১৯১৩ সালের মডেলের অস্টিন গাড়ি
১০ অশ্বশক্তি, ৪-সিলিণ্ডার, ২টি আসন

টর্পেডো—৫৭৫০ টাকা
৪ আসন—৬৫০০ টাকা।”

এই রকম নানা ধরণের বিজ্ঞাপন ক্রেতাদের মোটর গাড়ি কেনার আহ্বান জানাতো। এছাড়াও থাকতো ৩০ অশ্বশক্তির ম্যাক্সওয়েল, ব্রিট, ডজ, ফোর্ড ইত্যাদি মোটর গাড়িরও বিজ্ঞাপন। এগুলো চোখে পড়েছে সেই ১৯২০ সাল পর্যন্ত।

একটা মজার ব্যাপার নিশ্চয়ই সকলের চোখে পড়েছে?

কি সেটা নিশ্চয়ই জানতে চাও?

ব্যাপারটা হলো সেই স্টুয়ার্ট আর ডাইকস কোম্পানী। এরাই ঘোড়ার গাড়ি যখন কলকাতায় জাঁকিয়ে বসেছিলো তখন দামী দামী চমৎকার সব কোচ বা গাড়ি তৈরি করতেন। আবার ঘোড়ার গাড়ির যুগ শেষ হয়ে ঘোড়ায় টানা ট্রামের যুগও যখন পার হয়ে এসে গেলো মোটর গাড়ির যুগ—তখন তারাই আবার নেমে পড়ছেন আসরে।

তার মানে কি?

ব্যাপারটা হলো, বিজ্ঞাপনের মধ্য থেকেই পরিষ্কার বুঝে নেওয়া যায় এই সব নামী কোম্পানীরা ইংল্যান্ড আর অন্য সব দেশ থেকে মোটর গাড়ির ইঞ্জিন, চাকা বা টায়ার, নানা রকম দরকারী সব কলকব্জা এই সবই আমদানি করতেন আর ঘোড়ার গাড়ির আদলে আবার মোটর গাড়িরও কোচ বানাতেন। এরা ছিলেন কোচমেকার।

মোটর গাড়ি কলকাতায় আস্তে আস্তে অনেকই এসে গেলো।

আস্তে আস্তে প্রথম বিশ্বযুদ্ধও শেষ হয়ে গিয়েছিলো। দেশবিদেশে তাই মোটর গাড়িও পুরোদমে আসর জাঁকিয়েও বসেছিলো। তাদের মধ্যে প্রচুর বিখ্যাত গাড়িও ছিলো। এসব গাড়ির নাম কি রকম?

ঠিক কথা। সেটাই এবার দেখা যাক।

সেইসব গাড়ির মধ্যে ছিলো সেই বিখ্যাত রোলস রয়েস, ক্যাডিলাক, বুইক, ফোর্ড, পণ্টিয়াক, ওলডস্‌মোবাইল, মরিস, অস্টিন এই রকম আরও কতো কি।

১৯২৫ সাল নাগাদ কলকাতায় মোটর গাড়ি তেমন বেশি অবশ্য ছিলোনা বলা চলে—খুব সম্ভব হাজার দশেক। খুব জনপ্রিয় গাড়ি ছিলো মরিস এইট্‌ আর অস্টিন।

কিন্তু মোটর গাড়ি তো পয়সাওয়ালা লোকেরই গাড়ি—সাধারণ মানুষ তো মোটর কিনে চড়তে পারেনি। তাহলে তাদের জন্য কি ব্যবস্থা ছিলো।

কথাটা জানা অবশ্যই জরুরী। হ্যাঁ, সাধারণ মানুষের জন্য এসেছিলো স্বাভাবিক ভাবেই ভাড়ার গাড়ি।

ভাড়ার গাড়ি মানে কি?

ভাড়ার গাড়ি বলতে নিশ্চয়ই ট্যাক্সি জাতীয় কিছুই বোঝায়, তাই না? বেশ, তাহলে এবার দেখি এসো কলকাতায় পরিবহনের কাজে কবে ট্যাক্সি চলতে শুরু করে?

● কলকাতায় ট্যাক্সি এলো

মোটর গাড়ি যখন কলকাতার রাস্তায় বেশ পরিচিত হয়ে উঠেছিলো তখনই এসে গেলো পরিবহনের সুবিধার জন্য ট্যাক্সি। আজকের মত ছোট আকারের গাড়ি।

সেই সব ট্যাক্সির মধ্যে চোখে পড়তো ওলডস্মোবাইল, শেভ্রোলে, নানা নামেরই গাড়ি। অনেক ট্যাক্সির চাল বা হুড থাকতো খোলা, কাপড়ের।

কলকাতা শহরে তাহলে প্রথম ট্যাক্সি দেখা যায় কবে?

কলকাতার রাস্তায় সর্বপ্রথম এই ট্যাক্সির দেখা মেলে ১৯০৬ সাল বরাবর। তবে, প্রথম ট্যাক্সি তেমন জনপ্রিয় হলোনা। কারণ হলো ট্রামের তুলনায় বেশি ভাড়া।

কিন্তু হলে কি হবে, কলকাতার লোকসংখ্যা তখন বাড়ছে তো বাড়ছেই। অতএব কাজে কর্মে—বিশেষ করে যেসব জায়গায় অন্য পরিবহন ব্যবস্থা ছিলো না, সেই জায়গায় যাওয়ার জন্য ট্যাক্সিই হয়ে দাড়ালো ভরসা।

তখনকার দিনে ট্যাক্সির ভাড়া কেমন ছিলো?

সেটাই দেখা যাক এবার।

ট্যাক্সি ছাড়ার আবার নির্দিষ্ট জায়গাও ছিলো সেসময়। ভাড়া পড়তো মাইল প্রতি আজকের ৫০ পয়সা আর তখনকার আট আনা। চৌরঙ্গীর সামনে ছিলো তখনকার সেই বিখ্যাত মোটর গাড়ির ব্যবসাদার ফ্রেঞ্চ মোটর কার কোম্পানী। সেখান থেকে মিটার বসানো সব ট্যাক্সি গাড়ি যাতায়াত করতো। সেসব গাড়ির আবার নামও ছিলো। কি নাম জানো? ওভারল্যান্ড গাড়ি। ভাড়া মাইলে আট আনা আর তার সিকি মাইলে দু আনা।

মিটার বসানো ট্যাক্সি কলকাতা শহরের চৌহদ্দী ছাড়িয়ে ঢের দূর পথও পাড়ি দিতো—তারা যেতো একেবারে উত্তরে বারাকপুর পর্যন্তও, আর দক্ষিণে বজবজ, ক্যানিং অবধি।

আরও একটা মজার ব্যাপারও এই ট্যাক্সির থাকতো।

সেটা কি?

সেটা হলো ওই সব প্রথম আমলের ট্যাক্সির নম্বর থাকতো ইংরাজী 'A' অক্ষর দিয়ে। আর তাই তাদের নাম হয়েছিলো 'এ' কোম্পানীর ট্যাক্সি। কলকাতায় এসময় তাদেরই প্রায় শ'খানেক ট্যাক্সি চলাচল করতো।

আজকের কলকাতার ট্যাক্সির সংখ্যার সঙ্গে ব্যাপারটা একটু মিলিয়ে নিতে পারো। আজ কলকাতায় প্রায় হাজার দশেক ট্যাক্সি থেকেও যেন নেই।

দরকারের সময় তারা হয়ে ওঠে ডুমুরের ফুল।

আরও একটা কথা জানা চাই।

সেটা কি ?

হ্যাঁ, প্রশ্নটা ঠিক। এর উত্তর হলো সে সময় কলকাতা শহরটায় ট্যাক্সি চালাতো কারা ?

মজার কথা হলো, কলকাতায় প্রথম ট্যাক্সি চালু হওয়ার সময় কিন্তু আজকের মত শিখ ড্রাইভারের দেখা মেলেনি। মিলবে কি, তখনও তারা কলকাতা শহরে এসে পেঁছয়নি। কলকাতার ট্যাক্সি তখন পুরোপুরি চালাতো বাঙালি ট্যাক্সিওয়ালা বা ড্রাইভাররাই।

কিন্তু বাঙালি ড্রাইভারেরা ট্যাক্সি চালালে হবে কি, তাদের মধ্যে দেখা দিচ্ছিলো নানারকম বদগুণ। পয়সা কড়ি তারা বেশ ভালোই রোজগার করতো। কিন্তু লোকে বলে মানুষকে সুখে থাকতে ভূতে কিলোয়। অতএব তাদের মধ্যে উচ্ছৃঙখলতা আর নানা দোষ দেখা দেওয়ায়, যেমন ইচ্ছেমত ট্যাক্সি না চালানো, কামাই করা, এই সব দেখা দেওয়ায় লোকে বিরক্ত হয়ে উঠলো। শেষ পর্যন্ত এ সমস্যার সমাধান হলো কি ভাবে ?

এ প্রশ্ন স্বাভাবিক।

এর জবাব হলো, ট্যাক্সি চালানোর সমস্যা থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্যই কলকাতায় প্রথম শিখ ড্রাইভারদের আনা হলো।

হ্যাঁ, সেই হলো শুরু। আস্তে আস্তে শিখ ড্রাইভাররাই আসর জাঁকিয়ে বসলো। তারা ট্যাক্সি চালানোর কাজে দারুণ দক্ষ ছিলো আর পরিশ্রমী তো বটেই।

কলকাতা শহরের পরিবহন তখন বেশ প্রয়োজনীয় আর দারুণ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিলো। কলকাতা শহরটা তো সমান তালে বড় হচ্ছিলো আর বাড়ছিলো তার লোক আর স্বভাবতই দৈনিক যাত্রী সংখ্যা।

কিন্তু হলে কি হবে, তখনকার ট্রাম আর ট্যাক্সি সমস্যা মিটিয়ে দিতে পারছিলো না। অর্থাৎ আরও যানবাহন দরকার ছিলো।

তাহলে এবার কি হলো ?

হ্যাঁ, সেই কথাই এবার দেখা যাক।

কলকাতা শহরে এবার দরকার হয়ে পড়েছিলো পৃথিবীর অন্যান্য সব বড় শহরে যা যাত্রী বহন করছিলো, সেই বাস।

কলকাতা শহরে ট্যাক্সি আর ট্রাম চলতে দিয়ে চলো এবার তাহলে আমরা একটু দেখে নিই বাস এলো কি করে এ শহরটায়।

● কলকাতায় প্রথম বাস

পালকি, ঘোড়ার গাড়ি, ঘোড়ায় টানা ট্রাম তারপর বিদ্যুতের ট্রামের শেষে

কলকাতা পেয়ে গিয়েছিলো মোটর গাড়ি আর ট্যাক্সি। এরা সবই ছিলো পরিবহনের হাতিয়ার, তাই না ?

হ্যাঁ, ঠিক কথা।

কিন্তু এ সত্ত্বেও পরিবহন সমস্যা মিটছিল না।

সময় বা কাল তখন বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিক।

এবার সরকার মাথা ঘামাতে আরম্ভ করলেন বাস আনা যায় কি না তাই নিয়ে। কিন্তু এর মধ্যে একটা মজার কথাও আছে।

কথাটা কি জানো ?

কথাটা হলো, কলকাতা শহরের কাছে কিন্তু বাস জিনিসটা একেবারে অপরিচিত কিছু ছিলোনা। অর্থাৎ কলকতায় বাসের মত যান একবার আগেই চলেছিলো।

কিন্তু সে আবার কবে ?

সেটাই এবার দেখা যাক, এসো।

আসলে প্রথম যুগের সে বাসকে বড় মাপের ঘোড়ার গাড়িই বলতে পারা যায়। সে বাস চলেছিলো ১৮৩০ সালে—যখন ঘোড়ার গাড়ি আসর জাঁকিয়ে বসেছিলো। ওই সময় বিরাট একটা বাসে যাত্রী বোঝাই করে ধর্মতলা থেকে ব্যারাকপুর পর্যন্ত চালানো হয়—টেনেছিলো তিনটে ঘোড়া।

এটাতো মোটরের গাড়ি নয়, তাই বাস বলা কতখানি ঠিক তাতে সন্দেহ আছে।

সেটা না হয় হলো। তাহলে এবার কথাটা হলো মোটর বাস কবে চালু হলো যতোদূর জানা গেছে—কলকাতা শহরে প্রথম মোটর বাস চালু হয়েছিলো বিশ শতকের গোড়ার একটু পরে—১৮২২ কি ১৮২৩ সাল নাগাদ।

কলকাতার মানুষের তাগিদেই শেষ পর্যন্ত কোন কোন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এই বাস আনার কথাটা ভাবছিলেন। তারা বুঝেছিলেন কলকাতা শহরে বাস চালু করলে দারুণ একটা লাভেরই ব্যাপার হবে তাতে আর সন্দেহ নেই।

আর এই ভাবেই একদিন কলকাতার পথে বাস ছুটতে দেখা গেলো।

কলকাতায় এই মোটর বাস তাহলে এনেছিলো প্রথম দিকে কারা ?

হ্যাঁ, চমৎকার প্রশ্ন। কলকাতার যানবাহনের ইতিহাসের পাতা উল্টে সেটাই এবার দেখতে পারি। এতো সেই যানবাহনের বিবর্তনেরই ইতিকথা।

কলকাতা শহরে সেই প্রথম বাস চালানোর গৌরব ছিলো ওয়ালফোর্ড নামে এক পরিবহন কোম্পানীর। সেসব বাসের রঙ ছিলো টকটকে লাল আর সব বাসই ছিলো একতলা।

এই ওয়ালফোর্ড কোম্পানীই কলকাতায় বাস চালানোর প্রথম পথ প্রদর্শক হয়ে আছেন আজও।

প্রথম ট্রাম চালানোর সময় কলকাতার মানুষের মধ্যে যেরকম একটা সাড়া পড়ে গিয়েছিলো, বাস চালানোর সময় কিন্তু তেমন একটা হয়নি। একতলা বাস কলকাতার রাস্তার উপর দিয়ে তো ছুটলো, কিন্তু দোতলা বাস এরপর এসেছিলো কি ?

ভারি চমৎকার একটা প্রশ্ন সন্দেহ নেই।

হ্যাঁ, জেনে রাখতে পারো সেই প্রথম বাস চলার যুগেও কলকাতা শহরে দোতলা বাসও চলেছিলো।

কিন্তু এখানে ভারি মজার একটা ব্যাপার আছে।

মজার ব্যাপারটা হলো, সে সময় ওই ওয়ালফোর্ড কোম্পানীই কলকাতায় দোতলা বাস আমদানী করে ফলাও করে চালু করলেন। আর সে সব বাসের কিন্তু চাল ঢাকা না থেকে খোলা থাকতো। অর্থাৎ বৃষ্টি পড়লেই যাত্রীরা ভিজে একসা। একতলা বাস চালু হওয়ার বছর চারেক পরে—১৯২৬ সাল নাগাদ, ওই দোতলা চাল খোলা বাস অর্থাৎ ডবলডেকার বাস চালু হলো।

তা বৃষ্টিতে ভেজার ভয় থাকলেও কিন্তু যাত্রীরা মোটেই ঘাবড়াতো না। তারা দিব্যি ছাতা মাথায় দিয়ে বসে থাকতো। একতলায় অবশ্য এসব ঝুট ঝামেলা থাকতো না।

তবে লোকে কিন্তু দোতলা বাসই পছন্দ করতো। বিশেষ করে গ্রীষ্ম কালের বিকেলে ঘুরে ফিরে দক্ষিণী হাওয়ায় দোতলায় বসে বাসে বেড়াতে সকলেরই বেশ ভালো লাগতো। তাই বিকেলে ভিড়ও হতো বেশ।

এসব বাস কোথা থেকে কোথায় চলতো সেটা এবার দেখা যাক। ওয়ালফোর্ড কোম্পানীর বাস চলতো শহরের নানা জায়গায়। কালীঘাট থেকে শ্যামবাজার ছিলো একটা রুট। বৌবাজার, ধর্মতলা হয়ে এগুলো চলাচল করতো। দক্ষিণে কালীঘাট মন্দিরে যাওয়ার পথে রসা রোডে ছিলো একটা বাস ডিপো সেখান থেকে বাস ছাড়তো—২ নম্বর বাস। আবার বাস থাকতো ধর্মতলার কাছে বেণ্টিঙ্ক স্ট্রীটেও।

অন্য আর একটা রুটের বাস চলতো শিয়ালদা স্টেশন পর্যন্ত। এ সব বাসে যাত্রী নেহাত কম হতোনা।

ওয়ালফোর্ড কোম্পানী বেশ ভালো করেই বাস চালাচ্ছিলেন। ক্রমে তাদের বাসের সংখ্যাও ঢের বাড়লো। নতুন নতুন রুটও খোলা হলো। তখন তো সরকারী বাস ছিলোনা—সবই প্রাইভেট কোম্পানীর বাস।

১৯২৪ সাল নাগাদ কলকাতা শহরে মোট বাসের সংখ্যা দাঁড়ালো প্রায় ৬০ খানার মতই। সেটা একবছরে বেড়ে প্রায় দাঁড়ায় শ'আড়াইয়ের কাছাকাছি। কলকাতা শহরে তখন যানবাহন সমস্যা তো আজকের মত এমন জটিল হয়ে পড়েনি তাই যে যুগের মত কাজ চলে যাচ্ছিলো। এরমধ্যে শহরের বাইরের কিছু বাসও সরাসরি কলকাতায় আসতে আরম্ভ করেছিলো।

ওইসব বাসেও দেখা যেত শিখ ড্রাইভারই সংখ্যায় বেশি। মজার ব্যাপার ছিলো, কন্ডাক্টররা সেই তখন থেকেই হাঁক ছাড়তে শিখলো—'একদম খালি গাড়ি আসুন, আসুন।' কন্ডাক্টররা ক্রমে বাসের রড ধরে ঝুলে যাওয়ার চমৎকার কসরতও শিখে ফেললো।

কলকাতার সব যানবাহন এবার পুরনো হতে আরম্ভ করলো, সময়ও এগিয়ে চললো।

বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝিই আমরা পেঁছে গেলাম এবার।

কলকাতা শহর তখন আর আগের মত আর নেই। কলকাতায় তখন থেকেই, 'ঠাঁই নেই ঠাঁই নেই ছোট সে তরী'। কলকাতায় তখন লফলম লোক উপচে পড়েছে—যানবাহনেও যেদিকে তাকানো যায় সেই বাদুর ঝোলা শুরু।

রাজনীতিতেও কিন্তু সে সময় ঘটে গেছে পট পরিবর্তন। ভারতবর্ষ দীর্ঘ আন্দোলনের পর পেয়ে গেছে স্বাধীনতা। কলকাতার গুরুত্ব তখন দারুণ বেড়ে গেছে। দেশ ভাগের ফলে ছিন্নমূল লক্ষ লক্ষ মানুষ আছড়ে পড়েছে পশ্চিম বাঙলায় আর রাজধানী শহর কলকাতায়। বলতে গেলে কালকাতার জনসংখ্যা তখন থেকেই তার সীমা ছাড়াতে শুরু করেছিলো আর তারই ফলে যানবাহন সমস্যাটাও প্রচণ্ড ভাবে বাড়তে শুরু করলো।

হ্যাঁ, সেই তো শুরু। আজও সেই যানবাহনের সমস্যা মেটেনি—ভাবতে হচ্ছে নতুন নতুন পথের কথা।

কিন্তু সে কথা যাক, আমরা দেখে নিই শেষ পর্যন্ত বাসের রূপরেখা কেমন বদলালো।

স্বাধীন ভারতে পশ্চিম বাঙলার মুখ্যমন্ত্রী হয়ে এলেন এরপর সেই বিখ্যাত পুরুষ ডঃ বিধানচন্দ্র রায়। ডঃ রায় গঠন করলেন এবার কলকাতার সরকারী পরিবহন প্রতিষ্ঠান—কলকাতা স্টেট ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশন। সেটা ১৯৪৮ সালের কথা। ৩১শে আগষ্ট ১৯৪৮। তখন থেকেই কলকাতা শহরের বুকে চলতে শুরু করলো মজবুত বিশালাকৃতি সব লেল্যান্ড বাস। প্রথমে একতলা, তারপরে এসে গেলো দোতলা অর্থাৎ ডবল ডেকার বাস। এসব বাসের থাকতো বাঘের মাথার ছাপ—প্রতিষ্ঠানের প্রতীক।

কলকাতায় এরপর আস্তে আস্তে বন্ধ করে দেওয়া হলো প্রাইভেট বাস চলা। পরিবহন সমস্যাটা কিন্তু রয়েই গেলো—মানুষ সেই বাদুড় ঝোলা হয়েই চলাচল করতে লাগলো। আরও আশ্চর্য হওয়ার কথাটা হলো এতো যাত্রী থাকলেও স্টেট বাসে লোকসান হয়েও চললো।

এরপর কলকাতায় এসে গেলো আবার আর্টিকুলার বাস—অর্থাৎ ত্রিতল বাস। সে অবশ্য তেমন বেশি নয়।

এতো বাস চালিয়েও সমস্যা মিটতে চাইলো না। তাই আবার কলকাতায়

অনুমতি দিলেন সরকার প্রাইভেট বাস চালাতে। বহুদূরের বাসও আসতে যেতে শুরু করলো এখান থেকে—সেই দার্জিলিং, দীঘা, রাঁচি আরও কত জায়গায়। এদের বলা হয় দূরপাল্লার বাস।

১৯৭৫ সাল নাগাদ আবার চালু হলো নতুন ধরণের আরামপ্রদ কিছু বাস—ডিলুক্স বাস। এতে ভাড়া কিছু বেশিই। এবাসে কেবল বসে যাওয়ার ব্যবস্থা। পরে আর সেকথা মানলো না কেউ, দাঁড়ানোও চালু হলো। বাসেরও নাম বদলে গেলো।

হ্যাঁ, ঠিক ধরেছো—ওই ডিলুক্স বাস হলো স্পেশাল বাস।

পরিবহনের অবস্থা কিন্তু যে কে সেই। এবার নতুন করে আবার ভাবনা চিন্তা আরম্ভ হলো। ভাবতে লাগলেন কলকাতার পরিবহন সমস্য নিয়ে বিশ্বব্যাংকও।

শেষ পর্যন্ত ১৯৭২ সালে চালু হলো মিনিবাস। সব রকম বাসের রুটও বদালানো হলো, খোলা হলো ঢের নতুন রুটও। কত রাস্তাও বানানো হলো—গাড়ির জট ছাড়ানোর জন্য। শেষ অবধি আবার এলো উড়াল পুলও।

এখন কলকাতায় সরকারী বাস চলেছে প্রায় সাড়ে সাতশোর মত। আর বাকি সব মিলিয়ে মোট আড়াই হাজার বাস। তবুও কলকাতা যে তিমিরে সেই তিমিরে। কলক্যতায় লোক উপচে পড়ছে তো পড়ছেই। তবুও কিন্তু কলকাতার বাস ভাড়া ঢের কম।

বাসের কথা আমরা জেনে গেলাম। কলকাতা এখন জমজমাট। অতএব চলো আমরা আরও একটু পিছিয়ে দেখি।—

কিন্তু কি দেখতে চাই? পিছিয়েই বা যাবো কেন?

চমৎকার প্রশ্ন।

কথাটা হলো কলকাতায় ট্রাম, বাস ইত্যাদির মধ্যে এসে গিয়েছিলো আরও পরিবহনের নতুন যান ছোট খাটো সব গাড়ি,—আর সেটা কি জানো? সাইকেল অর্থাৎ দ্বিচক্রযান, আর—?

হ্যাঁ, ঠিক ধরেছো আমাদের অগতির গতি সেই রিকশ। যে রিকশ আজ কলকাতার দারুন এক সমস্যাই হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আরও বহু রকমের গাড়িও অবশ্য কলকাতার বুকে এসে আসর জাঁকিয়ে বসেছিলো। তারা কি জানো?

তারা হলো, লরী, ট্রাক, জিপ, টেম্পো, স্টেশন ওয়াগন এই রকম আরও কত কি? তবে এর বেশির ভাগই মাল পরিবহন করার জন্য।

জিপ অবশ্য তা নয়। জিপ কবে কলকাতায় আসে?

ভালো প্রশ্ন। জিপের মত খোলামেলা শক্তপোক্ত গাড়ির দেখা মেলে সেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকে যখন কলকাতায় সেনাদের আমদানী হয়। সেই থেকে তারা রয়ে গেলো। এনেছিলো আমেরিকান সৈন্যরা।

গাড়ির বিবর্তনও কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ঘটে চলেছিলো। কত নতুন নতুন গাড়িও আমদানি হতে লেগেছিলো। দেখতেও ভারি সুন্দর। আরও এসেছিলো মোটর সাইকেল, স্কুটার।

কিন্তু সেসব কথা রেখে চলো সেই বাইসাইকেল আর রিকশর চেহারাটা এবার দেখে নিই।

● সাত ●

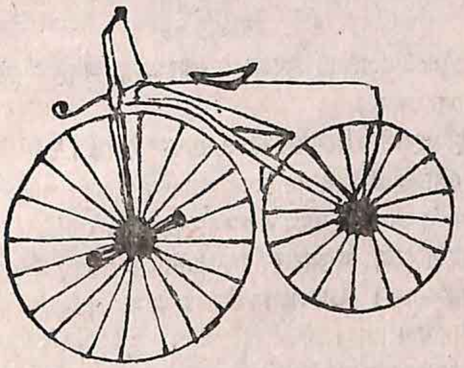
কলকাতায় সাইকেল আর রিকশ

● কলকাতায় সাইকেল

সাইকেলের জন্ম কোথায়, কবে, হয়েছিলো জানো? এর জন্ম হয় ইউরোপের ফ্রান্সে, প্রায় উনিশ শতকের একেবারে গোড়ার দিকে। প্রথম দিকে সাইকেলের চাকা বানানো হয় কাঠ দিয়ে, তখন প্যাডেল করা যেতো না। ঠেলে চালাতে হতো।

এই চাকার বেশ অদ্ভুত একটা নামও ছিলো। এর নাম ছিলো ভেলোসিপিড। এই চাকায় তৈরি সাইকেলকে তাই ভেলোসিপিডই গোড়ার দিকে বলা হতো।

কলকাতায় তাহলে প্রথম কবে সাইকেলের দেখা মিললো?



ভেলোসিপিড ১৮৬০

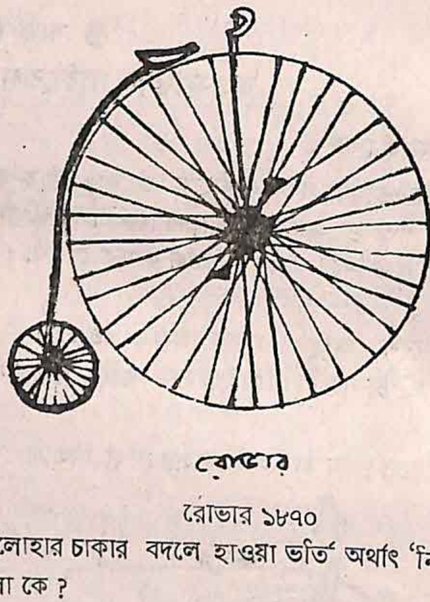
এবার তাই দেখা যাক।

শোনা যায় কলকাতায় প্রথম বাইসাইকেল দেখা যায় প্রায় উনিশ শতকের শেষ বরাবর প্রায় ১৮৯০ সালে। ততদিনে কিন্তু প্রাচীন ভেলোসিপিডের

বিবর্তনের ফলে হাওয়া ভরা টায়ার লাগানো হয়ে গেছিলো। হয়েছিলো নিরাপদও।

প্রথম ফ্রান্সে এই সাইকেল বা ভেলোসিপিড আবিষ্কারের পর ইংল্যাণ্ডে এসেছিলো উনিশ শতকের মাঝামাঝি। তখন হাওয়া ভরা টায়ার লাগাবার ব্যবস্থা হয়নি—থাকতো লোহার চাকা। এর নাম ছিলো 'বোন শেকার'। অন্য এক সাইকেল ছিল রোভার। সে ১৮৭০ সাল নাগাদ।

কি রকম মজাদার নামটা একবার ভেবে নাও। এর মানে হলো 'হাঁড় ঝাঁকানো' গাড়ি। কথাটা তাইই বটে—কারণ লোহার চাকার গাড়িতে হাড়ের আর কিছু থাকতো না।



রোভার ১৮৭০

তাহলে ওই লোহার চাকার বদলে হাওয়া ভর্তি অর্থাৎ 'নিউম্যাটিক টায়ার' আবিষ্কার করলো কে?

হ্যাঁ, সে ইতিহাসটা জেনে নেওয়াও দরকার বৈকি।

এরকম হাওয়া ভর্তি নিরাপদ চাকা আবিষ্কার করে সকলের ধন্যবাদভাজন হলেন ১৮৮৭ সালে ডানলপ নামে এক স্কচ ভদ্রলোক।

হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছো, আজকের বিখ্যাত টায়ার প্রস্তুত কারক সেই ডানলপ কোম্পানী তারই নামে। ডানলপের টায়ার আজ পৃথিবী বিখ্যাত। তারা সব গাড়িরই টায়ার বানায়।

সাইকেল আবিষ্কার হতেই দারুন জনপ্রিয় হয়ে উঠলো। খুবই সস্তার আর মজার গাড়ি এই সাইকেল। দুচাকার সাইকেলের সঙ্গে সঙ্গে তিন চাকার বা ট্রাই সাইকেলও চালু হয়। অবশ্য এরকম সাইকেল রাস্তায় চলেনি।

সাইকেলের আকার নানা রকম হতো। কোনটার সামনের চাকা ছোট বা

বড়, কারও দুটো সমান। এরকম এক ধরণের মজবুত সাইকেল ছিলো 'রেসিং সাইকেল'। কোনটার ভর রাখার জন্য বড় চাকার পাশে ছোট ছোট চাকা। এক ধরণের সাইকেল ছিল হবিহর্স। সময় ১৮০০ সাল।



সাইকেল হবিহর্স

কলকাতায় সাইকেল বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠলো। সাইকেলের দোকানও গড়ে উঠলো। বেশির ভাগই বেণ্টিঙ্ক স্ট্রীট আর ধর্মতলা স্ট্রীটে। এরকম কত দোকান কিন্তু আজও আছে। ওই বেণ্টিঙ্ক স্ট্রীট আর ধর্মতলা স্ট্রীটই কলকাতার সাইকেলের আড়ত বলা যায়। এদের মধ্যে সবচেয়ে আদি ব্যবসায়ী হলেন নন্দী ব্রাদার্স। এখনও তার দোকান রয়েছে। সাইকেল বিদেশ থেকে আমদানী হতো।

সাইকেল নিয়ে মজাদার সব ব্যাপার স্যাপার আর উৎসাহের ঘটনা ঘটতো। এই সাইকেল চালানো নিয়ে ক্লাবও গড়ে ওঠে সে সময়। তাতে ইংরেজ আর বাঙালী সবাই হৈ হৈ করে যোগ দিতো। সাইকেলের দৌড়ও হতো তখন।

আরও মজার কথা হলো তখনকার সব বড় বড় কিছু নামী মানুষও সাইকেলের ভক্ত হয়ে ওঠেন। হবেন নাই বা কেন? এখানে ওখানে চট করে যেতে সাইকেল দারুন কাজে লাগতো। কলকাতার পরিবহন তো তখনও সহজ হয়নি।

অবশ্য মেয়েরা তখন তেমন করে সাইকেল চালায় নি। তারা সাইকেলে চড়ে আরও ঢের পরে। আজকাল সবাই সাইকেলে চড়ে—তাই সাইকেলের দিন ফুরোয় নি। তবে একজন মহিলা সাইকেল চড়ে কলকাতা বাসীদের চমকে দিয়েছিলেন সে সময়। তিনি কে জানো? আচার্য জগদীশচন্দ্রের স্ত্রী লেডি অবলা বসু।

সাইকেলকে কলকাতার পথে চলতে দিয়ে চলো এবার দেখি শহরটাতে সেই মানুষে টানা গাড়ি, রিকশ এলো কবে আর কেমন করে।

এবার রিকশ গাড়ি

ত্রিশ চল্লিশ বছর আগেকার কথা, বিদেশের কোন একটা দেশের একজন কূটনীতিক কলকাতার রাস্তা দিয়ে চলেছিলেন। হঠাৎ গাড়ি থেকে তার নজর

পড়লো রাস্তায় ঠুং ঠুং শব্দ করে রিকশওয়ালা রিকশ গাড়ি টেনে নিয়ে চলেছে আর গাড়িতে বসে রয়েছে ইয়া মোটা চেহারার সওয়ার। কূটনীতিক ভদ্রলোক একেবারে তাজ্জব। তিনি যে দেশ থেকে এসেছিলেন সেদেশে এরকম মানুষের টানা গাড়ি তো থাকা দূরের কথা, কল্পনাই করে না কেউ। তিনি তাই সারাক্ষণ আপন মনে বিড় বিড় করে চললেন '…চুঃ…চুঃ—মানুষ গাড়ি টানছে …মানুষ গাড়ি টানছে…।'

ব্যাপারটা অন্যান্য সব দেশের কাছে একটু অবাক লাগারই কথা।

তবে একটা কথা।

কথাটা হলো রিকশ গাড়ি কিন্তু ভারতে আবিষ্কার হয়নি। হয়েছিলো অবশ্য এশিয়ারই অন্য এক দেশে—জাপানে। ১৮৭১ সালে জাপানে রিকশর আবির্ভাব ঘটে। রিকশ নামটা এলো তাহলে কোথা থেকে?

ভালো প্রশ্ন।

রিকশ কথাটাও আসলে জাপানী। আসল কথাটা হলো 'জিন-রিকি-শ' যার মানে হলো 'মানুষের টানা গাড়ি'। কথাটা শেষ পর্যন্ত দাঁড়ালো রিকশতে।

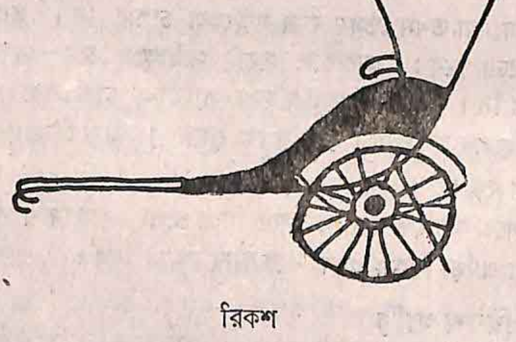
জাপান থেকে রিকশ গাড়ি বেশ তাড়াতাড়িই কিন্তু ভারতবর্ষে পেঁছে গেলো।

কলকাতায় তাহলে রিকশ কবে আসে?

সে কথায় পরেই আসছি, আগে দেখা যাক ভারতে এ গাড়ি কবে পেঁছিলো।

১৮৭১ সালে জাপানে রিকশ'র জন্ম এতো আগেই জেনেছো। মাত্র ন'বছরের মধ্যে ১৮৮০ সালে এ গাড়ি পেঁছে গেলো ভারতবর্ষে—প্রথম সিমলা শহরে।

কলকাতায় এলো আরও কুড়ি বছর পরে ১৯০০ সালে। কারা এই রিকশ



রিকশ

কলকাতায় আনলো জানো? কোন ভারতীয় নয়—এ গাড়ি এনেছিলো কিছু চীনা বাসিন্দা। প্রথমে কিন্তু তারা বলেছিলো রিকশয় শুধু মালপত্র বহন

করা হবে। কিন্তু বললে কি হবে ১৯১৪ সাল নাগাদ সরকারের অনুমতি নিয়ে তাতে চড়তে আরম্ভ করে দিলো চীনারা।

ব্যস, এই ভাবেই কলকাতায় রিকশ চড়তে শুরু করলো মানুষ। আর সেই থেকে রিকশই হয়ে উঠলো অগতির গতি।

আস্তে আস্তে কিন্তু রিকশ চালানোর কর্তৃত্বটা আর চীনাদের হাতে রইলো না। এটা আস্তে আস্তে চলে গেলো বিহারীদেরই হাতে। রিকশর অনেক বিবর্তনও ঘটে গেলো। আগেকার রিকশর সঙ্গে আজকের রিকশর ঢের তফাত।

আরও অনেক পরিবর্তনও সঙ্গে সঙ্গে ঘটে গেলো।

সেটা কি জানো?

হ্যাঁ, সেটা হলো রিকশ গাড়ির মালিকানায় আর ভাড়ায়। প্রথম প্রথম ভাড়া ছিলো মাইলে মাত্র আনা দুই।

কিন্তু তা যাই হোক না কেন, রিকশই কিন্তু অন্য সব রকম যানবাহনের মধ্যে দ্রুত কলকাতার পথ ঘাট ছেয়ে ফেলতে লাগলো। আসলে বহু মানুষ রিকশর উপর নির্ভর করতে শুরু করেছিলেন। আর এর কারণও ছিলো। কারণটা হলো, রিকশ, জলে ডোবা পথে, গলি ঘুঁজিতে বা জ্যামজটে পথে অন্যান্য যানবাহন থেমে গেলে মানুষকে তার গন্তব্যস্থলে ম্যাজিকের মতই পেঁছে দেয়। এ হয় তখন যাত্রীদের কাছে একেবারে স্বর্গের আশীর্বাদ।

এর মধ্যে একটু মজার ব্যাপারও আছে।

ব্যাপারটা হলো, রিকশ গাড়ি দক্ষিণ কলকাতার চেয়ে উত্তর কলকাতাতেই চলেছে বেশি। আবার ইউরোপীয়রা রিকশর নিন্দে করলেও দরকারের সময় তারাও কিন্তু রিকশর স্মরণ নিয়েছেন।

কলকাতা শহরের পরিবহন কিন্তু এই ধীর গতি যানের জন্য একেবারে মাঝেমাঝেই জট পাকাতে শুরু করেছিলো। আরও একটা কথা, কথাটা হলো, কলকাতায় আবার ঠেলাগাড়িও এসে গিয়েছিলো। সেটা অবশ্য বালি পরিবহনের কাজে।

রিকশ কারা ব্যবহার করতো বা আজও করে? কলকাতার সব মানুষই দরকার মত রিকশ চড়তো বা চড়ে। কেউ কেউ আবার মাসিক বন্দোবস্ত করে অফিস কাছারী, ইস্কুল কলেজেও যায়।

রিকশ চলার বিরাশি বছর পরে কেউ নিশ্চয়ই তর্ক তুলতে পারবেন না যে রিকশ দারুণ যানই হতে পারে।

আরও একটা আশ্চর্য ব্যাপার হলো, রিকশ চড়লে কিন্তু মানুষ যেন সব ভুলে যায়—ভুলে যায় সময়ের কথা। সময় যেন হারিয়ে যেতেই চায়।

রিকশয় কজন মানুষ চড়ে?

হ্যাঁ, একটা মজার প্রশ্ন।

সাধারণতঃ দুজন মানুষই রিকশ চড়ে। তবে বেশিও মাঝে মাঝে চোখে পড়ে। মজার দৃশ্যেরও অভাব হয় না—বিশাল চেহারার কেউ রিকশয় উঠলে কখনও সখনও তা উল্টেও যায় বা ভেঙ্গে পড়ে। সে হয় পথচারীদের এক হাসির খোরাক।

অবশ্য রিকশ মানুষের এতো সুবিধে করে দিলেও অসুবিধাও কম করতে চায় না। রিকশওয়ালারা শহরটা জলে ডুবে গেলে, অবশ্য বৃষ্টির সময়—আর অন্যান্য গাড়ি ঘোড়া বন্ধ থাকলে ইচ্ছে মত ভাড়া হাঁকে আর যাত্রীদের করার কিছুই থাকে না তখন।

কলকাতা শহরে কত রিকশ গাড়ি আছে ?

হ্যাঁ, এটা জেনে নেওয়া যেতে পারে।

১৯৪৯ সালে কলকাতায় রিকশর সংখ্যা ছিলো মাত্র ৬০০০ হাজার। তখন থেকেই কিন্তু পুলিশ আর নতুন লাইসেন্স দেয়নি। তাসত্ত্বেও রিকশর সংখ্যা কিন্তু বেড়েই চলছিলো। আর বাড়তে বাড়তে দাঁড়িয়েছিলো প্রায় ৬০,০০০ হাজারের কাছাকাছি। কি এলাহি ব্যাপার ভাবো একবার।

কলকাতা শহরের যানবাহনের জট ছাড়াবার উদ্দেশ্যে কিন্তু শেষ পর্যন্ত সরকার ঠিক করে ফেলেন কলকাতার বুক থেকে রিক্সা ধাপে ধাপে বন্ধ করে দেওয়া হবে। আর একাজের মুখবন্ধ হিসেবে সরকার বহু রাস্তায় রিকশা বা ঠেলা চলাচল বন্ধ করে বহু বেআইনি রিকশও আটক করেছেন।

কিন্তু এসব করেও কলকাতায় রিকশ বন্ধ হয়নি—বহাল তবিয়তেই চলেছে। কলকাতার কাছাকাছি কোথাও কোথাও আবার সাইকেল রিকশও চোখে পড়ে। যেমন টালীগঞ্জ বা বালীগঞ্জ অঞ্চলের কসবায়।

রিকশ চালানোর ব্যাপারে কিছুটা সামাজিক অন্যায়ও কিন্তু লুকিয়ে আছে। তাই না ?

হ্যাঁ, সে কথা ঠিকই। রিকশা যারা চালায় তাদের হয় অমানুষিক পরিশ্রম। গ্রীষ্মকালে গরম পীচের রাস্তায় গলদঘর্ম তাদের ছুটতে দেখে কারই বা কষ্ট না হয় ? রিকশওয়ালাদের জীবনে আনন্দ বলে কিছু নেই। দেশ গাঁ ছেড়ে তারা শুধু এই কায়িক পরিশ্রমই করে চলে—অনেকেরই হয় কঠিন অসুখও। সিনেমা, থিয়েটার ইত্যাদি দেখাও তাদের ভাগ্যে জোটে না। অনেকেই বছরে একবারের বেশি দেশেও যেতে পারে না। আর এসবের জন্য তারাও আজকাল হয়ে গেছে খুবই চতুর—তারা ইচ্ছেমত ভাড়াও নিয়েছে বাড়িয়ে।

তাই মনে হয় বিংশ শতাব্দীর এই সভ্যতার যুগটাতে রিকশর মত প্রাগৈতিহাসিক শকট বোধ হয় তুলে দিলেই ভালো।

কলকাতা শহরে সরকার তাই এবার ভাবছেন দিল্লী আর অন্যান্য কিছু শহরের মতই স্কুটার ট্যাক্সি চালু করতে।

একটু সান্ত্বনার কথা, এখনও পৃথিবীর কিছু শহরে রিকশ রয়ে গেছে।

কোথায় কোথায় জানো? যেমন চীনদেশের রাজধানী বেজিংএ, সাংহাইতে আর হংকংয়েও।

কলকাতা শহরের সমস্ত রকম যানবাহনের কথাই মোটামুটি আমরা জেনে ফেললাম। এরই মধ্যে আবার এসে গেছে অটোট্যাক্সিও।

এবার তাহলে কি জানতে বাকি আছে?

হ্যাঁ, এবার সেই কথাই দেখি এসো।

সেটা হলো রেল গাড়ির কথা, আর— ?

আর সেই আগামীদিনে কলকাতা শহরের মানুষ যা পেতে চলেছে সেই পাতাল রেল।

কিন্তু তার আগে রেলগাড়ির কথাটাই একটু দেখা যাক। যদিও রেলগাড়ি ঠিক কলকাতা শহরটার যান নয়—তবুও তা কলকাতা ছুঁয়ে যাচ্ছে তো, তাই জানতে দোষ কোথায়। আর রেলগাড়ি ছিলো বলেই না পাতাল রেল।

এবার তাহলে রেলগাড়ি, স্থলপথের আধুনিক যানবাহনের মধ্যে যা সবার সেরা।

● আট ●

রেলগাড়ি

● রেলগাড়ি প্রথম কবে চলেছিলো

রেলগাড়ি প্রথম চলেছিলো ১৮২৫ সালে ইংল্যান্ডে। কথাটা ঘুরিয়েই বলা উচিত, কারণ রেলগাড়ি তো নিজে থেকে চলেনা তাকে টেনে নেয় কোন ইঞ্জিন। হ্যাঁ, প্রথম রেলগাড়ি টেনে নেয় বাষ্পীয় ইঞ্জিন। তাহলে এবার দেখা যাক কবে বাষ্পীয় ইঞ্জিন আবিষ্কার হয়। কারণ সেটা জানাই আগে দরকার। যেহেতু বাষ্পীয় এই ইঞ্জিন আবিষ্কারের ফলে রেলগাড়ি সব দেশে চলতে শুরু করে। তবে তার আগে জানা চাই বাষ্পীয় শক্তি আবিষ্কার কাহিনী।

বাষ্পীয় শক্তির আবিষ্কারের ঘটনা বেশ মজার। তোমরা অনেকেই হয়তো সে গল্প জানো।

জেমস ওয়াট নামে এক ইংরাজ ছোট বেলায় কেতলিতে জল ফোটার সময় কেতলির ঢাকনা উষ্ণ জলের চাপে উঠতে দেখে বাষ্পীয় শক্তির কথা ভেবেছিলেন। ব্যস তিনি ওই কথা মনে রেখেই আবিষ্কার করলেন বাষ্পীয় শক্তি।

এটা কখন আবিষ্কার হয় ইতিহাসে হয়তো অনেকেই পড়েছো। হ্যাঁ,

সেই শিল্পবিপ্লবের সময় ইংল্যাণ্ডে আঠারো শতকের শেষদিকেই এটা আবিষ্কার হয়। আর এই বাষ্পীয় শক্তির সাহায্যে চলার উপযোগী রেল ইঞ্জিন আবিষ্কার করলেন জর্জ স্টিফেনশন নামে একজন ইংরাজ—১৮১৪ সালে। ১৮২৫ সাল নাগাদ জর্জ স্টিফেনশনের রেল ইঞ্জিন ইংল্যাণ্ডের লিভারপুল-ম্যাঞ্চেস্টার লাইনে প্রথম রেলগাড়ি টেনে নিয়ে চলেছিলো ৩০ মাইল বেগে।

তারপরেই এই রেলগাড়ি হয়ে উঠলো জনপ্রিয় আর সারা পৃথিবীর দেশে দেশে তা চালুও হয়ে গেলো। ফ্রান্সে ১৮২৯এ, আমেরিকায় ১৮৩০এ, জার্মানীতে ১৮৩৫ আর রাশিয়ায় ১৮৩৭ সালে।

ভারতবর্ষে আর কলকাতা শহরে কবে এলো রেলগাড়ি ?

হ্যাঁ, সেটাই দেখা যাক।

ভারতবর্ষে প্রথম রেলগাড়ি চলেছিলো সেই ১৮৫৩ সালের ১৬ই এপ্রিল। কোথায় জানো ? বোম্বাই শহর থেকে ২১ মাইল দূরে থানা নামের একটা জায়গা পর্যন্ত। মোটামুটি বাষ্পীয় ইঞ্জিন আবিষ্কারের ২৫ বছরের মধ্যে। বেশ তাড়াতাড়িই বলতে হয়। এ কৃতিত্ব সেই জর্জ স্টিফেনশনের ছেলে রবার্ট স্টিফেনশনের। তিনিই ভারতে রেল চালু করেন।

আর কলকাতায় ?

এবার তাই দেখি, এসো।

কলকাতা শহরে রেলগাড়ি চলার কথা ছিলো ১৮৫৪ সালের ১৭ই মে তারিখে ইংলণ্ডেশ্বরী মহারাণী ভিক্টোরিয়ার জন্মদিনে। কিন্তু তা শেষ পর্যন্ত হয়ে না ওঠায় ঠিক হলো চালু হবে ১৬ই আগষ্ট তারিখে।

তখনকার বাংলা কাগজ 'সংবাদ ভাস্করে' এ খবরটা কেমন ভাবে ছাপা হয়েছিলো একবার দেখো ঃ

"প্রকাশ হইয়াছে আগামী মাসের ১৬ তারিখে শ্রীল শ্রীযুক্ত গবরণর জেনরেল বাহাদুর সাধারণের গমনাগমনের উদ্দেশ্যে বঙ্গরাজ্যের রেইলওয়ে প্রতিষ্ঠা করিবেক··পেরুয়া পর্যন্ত প্রথম গতিবিধি হইবেক····।"

তখনকার বাংলা ভাষা এই রকমই ছিলো।

সেকথা যাক, ১৬ই আগষ্ট বাঙলাদেশে অর্থাৎ কলকাতা থেকে প্রথম রেলগাড়ি চলতে শুরু করবে ঠিক করলেও কিন্তু চালু হয়ে গেলো একদিন আগেই, অর্থাৎ ১৫ই আগষ্ট তারিখে। এই রেল চালাবার দায়িত্ব নেওয়ার জন্য ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে বা সংক্ষেপে ই· আই· আর· নামে রেল কোম্পানীও খোলা হয়। কোম্পানীর প্রথম কর্মকর্তা হলেন আর· ম্যাকডোনাল্ড স্টিফেনশন।

রেল চালানোর ব্যবস্থা করার জন্য লাইন)আগেই পাতা হয়। এ নিয়ে কিছু গোলমাল দেখাও দিয়েছিলো, তবে সেটা মিটেও যায়।

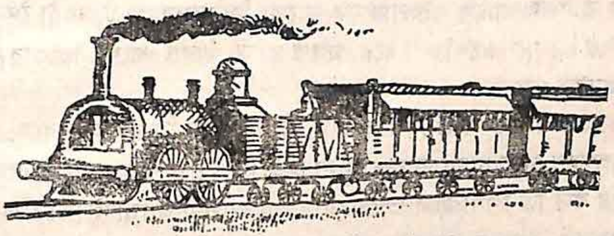
প্রথম রেলগাড়ির ভাড়া কেমন ছিলো ?

হ্যাঁ সেটা দেখা যাক।

প্রথম দিকের রেল গাড়ির ভাড়া ছিলো এইরকম ঃ

বালী পর্যন্ত	—	আট আনা (প্রথম শ্রেণী)
		তিন আনা (দ্বিতীয় শ্রেণী)
		এক আনা (তৃতীয় শ্রেণী)
শ্রীরামপুর	—	এক টাকা দু আনা (প্রথম শ্রেণী)
		ছ' আনা (দ্বিতীয় শ্রেণী)
		দু আনা (তৃতীয় শ্রেণী)
হুগলী	—	তিন টাকা (প্রথম শ্রেণী)
		এক টাকা দুআনা (দ্বিতীয় শ্রেণী)
		সাত আনা (তৃতীয় শ্রেণী)

রেল চালু হয়ে যাওয়ার পর বিভিন্ন কাগজে আবার জনসাধারণের জন্য প্রচুর বিজ্ঞাপনও দেওয়া হতো। যেমন কখন কোথা থেকে গাড়ি ছাড়বে, এই সব। হাওড়া থেকেই প্রথম রেল চলে।



রেল গাড়ি

রেল চালু হওয়ার সময় সেই কলকাতায় ঘোড়ার ট্রাম চালু হওয়ার সময়ের মত কি হৈচে দেখা দেয় ?

হ্যাঁ, প্রশ্নটা চমৎকার। সেটা একটু দেখি এবার।

রেল চালু হওয়ার আগে কলকাতা শহরের মানুষকে তা জানিয়ে দেওয়া হয়েছিলো। আর লোকে তাই আগে ভাগেই টাকা জমা দিয়ে আসন রিজার্ভ করতেও চেয়েছিলো। তিন হাজার মানুষ দরখাস্ত করেছিলো তবে অতো জায়গা তো ছিলোনা—জায়গা হয় মাত্র কয়েক শ' যাত্রীর। অনেকেই তাই দারুণ হতাশ হয়ে পড়ে।

প্রথম ট্রেনটাতে ছিলো তিনটে ফার্স্ট ক্লাস, দুটো সেকেণ্ড ক্লাস আর তিনটে থার্ড ক্লাস কম্পার্টমেণ্ট। তৃতীয় শ্রেণীর আবার ছাদ ছিলোনা। ফার্স্ট ক্লাসে আর সেকেণ্ড ক্লাসে কিন্তু চমৎকার গদী ছিলো। প্রথম গাড়ি ছেড়েছিলো হাওড়া থেকে সাড়ে আটটায় আর বালী পেঁছিয় এগারো মিনিট পরে আর হুগলী পেঁছিয় ১০টায়।

হ্যাঁ, এবার সেই প্রশ্নের উত্তর। কোনটা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো ? সেই

রেলগাড়ি চালু হলে কলকাতায় সে রকম হৈচৈ হয়েছিলো কিনা ?

হ্যাঁ, হৈ চৈ হয়েছিলো বৈকি। মানুষের মধ্যে দারুণ উৎসাহ জেগেছিলো। তাদের কাছে এ একেবারে নতুন জিনিস।

ব্যাপারটা বোঝ, বিরাট একটা লৌহদানব লোকবোঝাই একগাদা গাড়িকে লাইনের উপর দিয়ে অনায়াসে টেনে নিয়ে চলেছে। সকলের কাছে এ ছিলো একেবারে অস্বাভাবিক দৃশ্য। প্রথম রেল চলার দিনে তাই লাইনের দুপাশে হাজার হাজার ছেলে, বুড়ো, স্ত্রী পুরুষ হাঁ করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে দাঁড়িয়েছিলো। এমন তাজ্জব ব্যাপার যে ঘটতে পারে তারা স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি। প্রথম দিকে আসলে মানুষ বুঝতেই পারেনি রেলগাড়ি আবার কি রকম আজব জিনিস।

দারুণ সব মজার মজার ব্যাপারও রেলগাড়ি নিয়ে ঘটতো।

কি রকম ব্যাপার দেখে নাও একবার ঃ রেলগাড়ি দেখে রাস্তার দুপাশের লোকেরা গলবস্ত্র হয়ে প্রণাম করতো। তারা গল্প করে যারা তা দেখেনি তাদের বলতো, গাড়ির ওই সামনের কালো জিনিসের পেটে একটা দৈত্য আছে, সে পেটে আগুনের খোঁচা খেয়ে মাঝে মাঝে বিকট শব্দে চিৎকার করে ওঠে আর ছুটতে থাকে।

এরকম অদ্ভুত অদ্ভুত নানা কাহিনী রেলগাড়ি নিয়ে লেখা হলো আর কত যে গালগল্প চালু হলো তারও ইয়ত্তা নেই। কত কাগজপত্রে কত রকম ইনিয়ে বিনিয়ে কত কি লেখা হলো—ঢের হাস্যকর ব্যাপার স্যাপারই ঘটতে লাগলো।

অনেকে আবার মজার মজার এমন কান্ডও করলেন যে ভাবা যায় না। ভয়ে বহুলোক রেলগাড়িতে বহুদিন চড়েওনি। তাদের ধারণা হয়ে গিয়েছিলো রেলগাড়িতে চড়লেই আর বেঁচে ফেরা হবেনা। অনেকে চড়লেও তিথি, নক্ষত্র, পঞ্জিকা ইত্যাদি মিলিয়ে তবেই রেল গাড়িতে উঠতেন। অনেকের ধারণা ছিলো রেলগাড়িতে চড়লে আয়ু নির্ঘাৎ কমবে।

রেলগাড়ি নিয়ে অনেক কবিতা আর ছড়াও লিখলেন কবিরা। তাদের মধ্যে কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতা খুবই মজার।

কবিতাটা ছিলো এই রকম ঃ

"এসো কে বেড়াতে যাবে শীঘ্র কর সাজ।
ধরাতে পুষ্পক রথ এনেছে ইংরাজ··· "

রেলগাড়ি হয়ে উঠেছিলো একেবারে পুষ্পক রথ—অর্থাৎ স্বর্গের রথ।

রেলগাড়িকে লোকে ভয় পেলেও কিন্তু তার জনপ্রিয়তা হু হু করে বাড়তে শুরু করেছিলো। ক্রমে রেল লাইন আরও সম্প্রসারিত হলো। আস্তে আস্তে সারা ভারতেই রেল চালু হয়ে গেলো। কালীঘাট থেকে ফলতাও একটা লাইন চালু হয় ১৯১৭ সালে।

কলকাতার মধ্যে কিন্তু আর একরকম রেল ব্যবস্থা ছিলো—সেটা জঞ্জাল

অপসারণের জন্যই চালাতেন কলকাতা পুরসভা। এর নাম মিউনিসিপ্যাল রেলওয়ে। এটা ছিল ধাপা পর্যন্ত।

প্রথম দিকে রেল লাইন কেমন ছিলো? আর গাড়িই বা কেমন?

সেটা একটু দেখা যেতে পারে।

প্রথম দিকে লাইন ছিলো একটা। পরে কাজের অসুবিধার জন্য করা হয় ডবল লাইন।

আর গাড়ির কথাতো আগেই একটু বলেছি। গাড়িগুলো ছিলো চৌকো বাক্সের মত। তবে ফার্স্ট ক্লাসে গদী থাকতো। এসব গাড়ি আর ইঞ্জিন আনা হয় বিলেত থেকে। প্রথম দিকে হাওড়া স্টেশন এরকম ছিলোনা—আর হাওড়ার পুলও হয়নি। আগেকার পুল। তার নাম ছিলো 'পণ্টুন ব্রিজ'। সে ব্রিজ আবার খোলা যেত।

তাহলে ওপারে গিয়ে লোকে ট্রেনে চাপতো কেমন করে?

হ্যাঁ, এপ্রশ্নটা করা যায় বটে। কথাটা হলো রেল কোম্পানী আর্মেনিয়ান ঘাটে খুলে ছিলেন টিকিটঘর আর নৌকো বা লঞ্চে করে গঙ্গা পার হওয়ার ব্যবস্থা। ওপারে গিয়ে রেলে উঠতে হতো। প্রথম ওই ব্রিজ বানানো হয় ১৮৭৪ সালে। দ্বিতীয় হওড়ার ব্রিজ তৈরি আরম্ভ হয় ১৯৩৭ সালে শেষ হয় ১৯৪৫ সালে।

কলকাতা শহর এতোদিনে যানবাহন হিসেবে অনেক কিছুই পেয়ে গিয়েছিলো। বাষ্পীয় ইঞ্জিনের বদলে ক্রমে ক্রমে এসে গেলো ডিজেল ইঞ্জিন আর শেষ পর্যন্ত বিদ্যুৎ ইঞ্জিন। ভারতের রেল হয়ে উঠলো বিশ্বের অন্যতম সেরা।

ভারতে রেল কোম্পানীর শতবর্ষও উদ্‌যাপিত হলো। আর কলকাতার কি হলো?

কলকাতা এগিয়ে চলোছিলো।

আর?

আর পাল্লা দিয়ে বাড়ছিলো তার হাজারো রকমের সমস্যা। আর তার মধ্যে নিশ্চিত ভাবেই একনম্বর তার যানবাহন সমস্যা।

এসমস্যা এমন জটিল হয়ে ওঠার কারণ কি ছিলো?

কারণ একটাই। আর তা হলো, কলকাতা শহরের বিপুল লোকসংখ্যা। লক্ষ লক্ষ লোক আছড়ে পড়ছিলো কলকাতায়। সবারই একটামাত্র কথা ছিলো মুখে 'চলো কলকাতা'।

কিন্তু এই বিপুল যাত্রীসংখ্যার জন্য উপযুক্ত যানবাহনের ব্যবস্থা করা তো চাট্টিখানি কথা নয়—এরজন্য চাই অর্থ আর পরিকল্পনা। আর শুধু শহরে যানবাহন বাড়িয়ে কিন্তু এসমস্যার সমাধানও সম্ভব ছিলোনা।

ভাবছিলেন তাই সরকার আর সংশ্লিষ্ট সকলেই। অনেক প্রস্তাব এসে

পৌঁছলো এবার—কথা হলো কলকাতা শহরে চাই সার্কুলার রেল বা চক্ররেল। যে রেল শহরের অফিস পাড়া ডালহৌসী আর এসপ্ল্যানেড অবধি আসতে পারবে। আর লাঘব করবে যাত্রীদের সমস্যাও। কিন্তু এ প্রস্তাব কার্যকর করা হলোনা।

কেউ বললেন, হোক মনো রেল।

মনো রেল কি রকম ?

মনো রেল আছে ফ্রান্সে। এ গাড়ি রাস্তায় শূন্যে লাইনের নিচে ঝুলে চলে। এরজন্য চাই ওই লাইন। এটা পাতা হয় উড়াল পুলের আকারে ঝুলন্ত লাইন বসিয়ে।

কিন্তু এ প্রস্তাব শেষ পর্যন্ত বাতিল হয়ে যায়।

এরপর তাহলে কি হলো ? কলকাতার যানবাহন সমস্যা কি মিটবে না ?

প্রশ্নটা অবশ্যই ভেবে দেখার মত।

সমস্যার সমাধানের ব্যবস্থা হয়েছে বৈকি। কি সে ব্যবস্থা এবার নিশ্চয়ই আন্দাজ করতে পারছো ?

হ্যাঁ, ঠিকই ধরতে পেরেছো—এটা সেই পাতাল রেল বা মেট্রোরেল ব্যবস্থা। ভারতে এই কলকাতা শহরটাই পেয়েছে সবার আগে পাতাল রেল। এশিয়াতে কলকাতাই পেয়েছে পঞ্চম এই সম্মান, প্রথম যে চারটি শহরে মেট্রোরেল আছে তা হলো জাপানের রাজধানী টোকিও, কিয়োটো, ওসাকা আর নাগোয়া শহর। সবকটিই জাপানে। জাপানের সমস্যাও আমাদেরই মত—সেই ঠাঁই নেই অবস্থা।

কলকাতার যানবাহনে সমস্যা সমাধানের আরও একটা বড় বাধা এর স্বল্প পরিসর পথ। কলকাতা শহরকে ইচ্ছে মত তো বাড়ানোরও উপায় নেই। নেই ইচ্ছে মত রাস্তা চওড়া করারও উপায়। আসলে কলকাতা যেন যদৃচ্ছ গড়ে উঠেছে—এখানে চলেছে দ্রুতগামী আধুনিক লিমুসিনের পাশাপাশি ঠেলাগাড়ি আর রিকশও। আকাশচুম্বী অট্টালিকার পাশেই রয়েছে ঘিঞ্জি বস্তীও।

তবুও কলকাতার কিছু রাস্তাঘাট চওড়া করা হয়েছে, হয়েছে উড়ালপুল। নতুন করে গড়ে উঠেছে কিছু এলাকা, লবণ হ্রদ এইসব।

বিশ্বের বহু বিশেষজ্ঞের মতামত নেওয়ার পরই ভারত সরকার ঠিক করেন কলকাতার এই যানবাহন সমস্যার জটিল ব্যাধি দূর করার উপায় একটাই—পাতাল রেল বা মেট্রো রেল চালু করা। কিন্তু সেটাই শেষ কথা নয়, পাতাল রেলের সঙ্গে সঙ্গে শহরে চালু হবে চক্ররেল এটাও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। চক্ররেলও তাই চালুও হয়েছে ১৯৮৪ থেকে।

কলকাতা তাই গতিযুগের নতুন এক অধ্যায়ে প্রবেশ করতেই চলেছে।

চলো, আমরা সেই বিরাট কর্মযজ্ঞের ব্যাপারটা একটু দেখি এবার। দেখি কেমন করে চালু হল সেই পাতাল রেল নামক কর্মযজ্ঞ আর রেলচলার কাজ।

● নয় ●

কলকাতায় পাতাল রেল ও চক্ররেল

কলকাতায় যে পাতাল রেল চালু হয়েছে একথা ইতিমধ্যে সারা পৃথিবীর মানুষই আজ জেনে ফেলেছে। কলকাতার অনেক দুর্নাম—তা সত্ত্বেও কলকাতা তো কলকাতাই। আর আমাদের এই প্রিয় শহরকে তবুও আমরা ভালোবাসি তাকে সাজিয়ে তুলতে চাই। এর কারণ কি জানতো? কারণ কলকাতা আমাদের একান্ত প্রিয়।

এই পাতাল রেলই হয়েছে তার এক পদক্ষেপ। পাতাল রেল আমাদের গর্ব।

কিন্তু তার আগে, অর্থাৎ কলকাতায় যে পাতালরেল প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছিল সে কথা ভালোভাবে খতিয়ে দেখার আগে একটা কথা জেনে নিলে ভালো হয় না?

কথাটা কি অবশ্যই জানতে চাইবে তোমরা, কারণ সেটাই স্বাভাবিক।

কথাটা হলো, এই পাতালরেল, মেট্রো রেল বা টিউব রেল—যে নামেই একে ডাকো—সেটা আসলে কি, কবে, কোথায় এটা প্রথম চালু হয়, বিশ্বের কোন কোন শহরে এটা আছে। এই সব তথ্য জেনে নিলে মন্দ হয় না।

তবে সেটাই এবার একটু জেনে আমাদের জ্ঞান এক ধাপ বাড়িয়ে নিই না কেন? কলকাতায় এই পাতাল রেল চলতে শুরু করার আগেই তাই আমরা সেটাই জানতে চেষ্টা করছি।

তাহলে চলো বেড়িয়ে আসি বিশ্বের তাবৎ শহরগুলো আর জেনে নিই পাতাল রেলের ইতিহাসটা। সেটা যেমন মজার আর তেমনই স্বেদ ও শ্রমের ইতিহাস।

● পাতাল রেলের ইতিহাস

পৃথিবীতে প্রথম এই পাতাল রেল বা টিউব রেল কোথায় চালু হয় জানো?

লণ্ডন শহরে।

এই টিউব রেলের কথাটা প্রথম মাথায় জাগে লণ্ডন শহরের একজন সলিসিটর চার্লস পীয়ারসনের। একথাটা তিনি ভাবেন ১৮৪৩ সালে টেমস নদীর নিচে টানেল চালু করার কিছু পরেই। টিউব রেলের কথাটা তিনি ভেবেছিলেন লণ্ডন শহরের উন্নয়নের জন্য। বেশ কিছু বছর ধরে পার্লামেণ্টে আলোচনার পর ১৮৫৪ সালে লন্ডনের ফ্যারিংটন স্ট্রীট থেকে প্যাডিংটনের বিশপস্ রোড পর্যন্ত ৬·০৩ কিলোমিটার দীর্ঘ টিউব রেলপথ তৈরি মঞ্জুর

হয়। এই কাজ আরম্ভ হলো ১৮৬০ সালে 'কাট অ্যান্ড কভার' প্রক্রিয়ায় অর্থাৎ রাস্তা 'কাটো এবং ঢাকো' পদ্ধতিতে। একাজে প্রথমে রাস্তা বরাবর বিরাট গর্ত বা ট্রেঞ্চ খুঁড়ে পাশের দেয়ালগুলো ইঁট গেঁথে গার্ডার দিয়ে উপরের রাস্তা আবার সারিয়ে ফেলা হতে লাগলো।

প্রথম টিউব রেলের লাইন চালু হলো ১৮৬৩ সালের ১০ই জানুয়ারী। কাজে লাগানো হয় বাষ্পীয় ইঞ্জিন। প্রথম বছর কত যাত্রী ভ্রমণ করেছিলো শুনলে সত্যিই তাজ্জব হতে হয়—৯.৫০০,০০০ জন। প্রথম থেকেই লন্ডনের টিউব রেল দারুন সফল আর জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। লন্ডন শহরের বাসিন্দারা টিউব রেলে বেড়াতেই সব চেয়ে ভালোবাসে।

ইলেকট্রিকে ট্রেন চালানোর ব্যবস্থা হয় ১৮৯০ সালে। তখন ভাড়া ছিলো মাত্র দু পেনী—প্রতি তিন মাইল ভ্রমণের জন্য।

১৯৬০ সালের মধ্যে লন্ডনের এই পরিবহন ব্যবস্থায় গড়ে ওঠে ২৭৩টা স্টেশন আর ৩৯৩ কিলোমিটার দীর্ঘ পথ। লন্ডনের টিউবের ট্রেনের গতি ঘণ্টায় গড়ে ৩৩ কি.মি. এক একটা ট্রেনে গাড়ি থাকে ৮টা আর যাত্রী ধরে ১৩২৮ জন। এখন অবশ্য লন্ডনই বিশ্বের সব চেয়ে বেশি লোক বসতির জায়গা তাই লোকে টিউবে গাদাগাদি করেই যাতায়াত করে। লন্ডনের টিউবে শহর আর শহরতলীর সব জায়গাতেই সবচেয়ে সস্তায় যাওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে।

লন্ডনের দেখাদেখি ইউরোপের অন্যান্য দেশেও গড়ে উঠলো এরপর একে একে টিউব রেল ব্যবস্থা।

ফ্রান্সে এর জন্ম হলো ১৮৯৮ সালে প্যারী শহরে। সেখানে ফরাসীতে টিউব রেলের নাম কি জানো? স্যামী দ্য ফার মেট্রোপলিঁতা। ১৯০০ সালে চালু হয় গাড়ি চলাচল। ১৯৬০ সালে সেখানে ছিলো ২৭০টা স্টেশন আর ১৫টা বিভিন্ন লাইন। এখান থেকে প্যারী শহরের সব জায়গায় আর শহরতলীতে যাওয়া যায়। বছরে বেড়ান ১,১০০,০০০,০০০ যাত্রী। বিশ্বে নিউ ইয়র্কের পরেই এর স্থান।

এরপরে এলো জার্মানীর বার্লিন শহরে। জার্মানীতে এর নাম ইউ-বান্। এটা খোলা হলো ১৯০২ সালে। এখানে ৫৫.৫ মাইল দীর্ঘ পথ আর ১১১টা স্টেশন রয়েছে—যাত্রী বহন হয় ২৪০,০০০,০০০ জন। এরপর হলো হাম্বুর্গেও।

সেখানে আছে ৬৪টা স্টেশন, ৪৫.২৫ মাইল লাইন আর যাত্রী সংখ্যা ১৬৭,০০০, ০০০ জন, প্রতিবছরে।

ইউরোপের দ্বিতীয় বৃহত্তম আর বিশ্বের সেরা পাতাল রেল কিন্তু রয়েছে রাশিয়ার রাজধানী মস্কো শহরে। রাশিয়ার টিউবের নাম মেট্রো। এই মেট্রো সবচেয়ে সুন্দর। যেমন সুন্দর সাজানো এর স্টেশন তেমনই চমৎকার ব্যবস্থা। রঙীন কাচ আর ঝাড় লণ্ঠনের আলোয় সাজানো থাকে স্টেশন। জায়গাও

প্রচুর। আছে সুন্দর সুন্দর মূর্তিও। চারদিক মোজেইক করা।

মস্কো রেলের কাজ শুরু হয় ১৯৩২ সালে আর খোলা হয় ১৯৩৫ সালে। এর টানেল ১৭ ফিট চওড়া আর এর মধ্যে আছে ৫ ফিট চওড়া রেল লাইন। লণ্ডনের চেয়ে মস্কোর মাটির নিচে কাজ করা বেশ কঠিন ছিলো। এই মেট্রোয় রয়েছে প্রায় ৯০টি স্টেশন আর ৮৭ রুট মাইল। যাত্রী বহন হয় প্রায় বছরে ১,২০০,০০০,০০০ জন।

ইউরোপের অন্যান্য যেসব শহরে মেট্রো বা টিউব রেল এরপর গড়ে ওঠে সেগুলো হলো ঃ স্টকহোম, ভিয়েনা, মাদ্রিদ, এথেন্স, লেনিনগ্রাদ, লিসবন, রোম, মিলান, বার্সিলোনা, কিয়েভ, অসলো, বুদাপেস্ত, রটারড্যামও আরও কিছু শহরেও। এখানকার সব জায়গারই সিগন্যাল ব্যবস্থা স্বয়ংক্রিয় আর ব্রেক ব্যবস্থাও তাই। মজার কথাটা হলো সিগন্যাল না পেলে গাড়ি আপনাআপনিই থেমে যায়, বিপদের ভয় থাকে না।

এরপর আমেরিকা। আমেরিকায় প্রথম যুক্তরাষ্ট্রের বোস্টনেই টিউব রেল চালু হয়। সেটা সেই ১৮৯৭ সালে। এর দৈর্ঘ্য ১.৫ মাইল। এর নাম ছিলো ট্রলি গাড়ি।

নিউইয়র্কে টিউব রেল চালু হয় ১৯০৪ সালের ২৭শে অক্টোবর। নিউ-ইয়র্কের সমস্যা ছিলো খুব বেশি। কারণ শহরের সব আকাশছোঁয়া বাড়ি অর্থাৎ যার নাম স্কাই স্ক্র্যাপার। এই সব বাড়িকে বাঁচিয়ে কাজ করার জন্য ইস্পাতের বিম আর আনুভূমিক কাঠের পাটাতন বসিয়ে কাজ করা হয়।

নিউ ইয়র্কের মেট্রো পৃথিবীর মধ্যে হলো বৃহত্তম। এর দৈর্ঘ্য প্রায় ২৫০ রুট মাইল। স্টেশনের সংখ্যা প্রায় ৫০০। আর যাত্রী সংখ্যা? বছরে ১,৪০০,০০০,০০০ জন।

যুক্তরাষ্ট্রের আর কোথায় টিউব রেল আছে?

দেখা যাক সেটাই এবার।

টিউব রেল আছে ফিলাডেলফিয়া (১৯০৭), শিকাগো (১৯৪৩), টরোন্টো (১৯৬০), ইত্যাদি জায়গায়।

দক্ষিণ আমেরিকায় রয়েছে বুয়েনেস আয়ার্সে (১৯১৩)।

এশিয়ায় রয়েছে একমাত্র জাপানে সেটাতো আগেই জেনেছো।

জাপানে রয়েছে টোকিওতে। এটা চালু হয় ১৯২৭ সালে। তারপর কিয়োটোয় ১৯৩১এ। ওসাকাতে ১৯৩৩এ, নাগোয়ায় ১৯৫৭তে।

তুরস্কের ইস্তাম্বুলেও টিউব রেল রয়েছে। তাছাড়া পৃথিবীর আরও ৩০টি শহরেও আছে মেট্রো রেল। প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে আরও কয়েকটার।

তাহলে দেখতে পাচ্ছো, পৃথিবীর সব দেশেই যানবাহন আর পরিবহন সমস্যা সমাধানের উপায় হিসেবে টিউব রেল বা পাতাল রেলকেই বেছে নেওয়া

হয়েছে।

কলকাতার ক্ষেত্রেও তাই ব্যতিক্রম ঘটেনি। এখানেও তাই ইতিমধ্যেই চালু হয়েছে পাতাল রেল। যদিও দমদম থেকে টালিগঞ্জ পুরো কাজ এখনও শেষ হয়নি।

তাহলে, পৃথিবীর দেশ গুলো দেখে নেবার পর চলো আবার কলকাতায় ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে আসা যাক, আর দেখা যাক এখানকার এই প্রকল্প কবে কেমন করে শুরু হয় আর শেষই বা হয় কবে, কতটা পথই বা এখনও বাকি।

● কলকাতার পাতাল রেল

কলকাতা শহরটার নিন্দে করার কিন্তু লোকের অভাব নেই। কলকাতাকে তাই কেউ বলে 'গন্ধা শহর' কেউ বা বলে 'বস্তীর শহর' আবার কখনও বা সে হয়ে ওঠে 'মিছিলের শহর'।

কথাগুলো হয়তো ঠিক। তবুও কলকাতা কলকাতাই।

কবি গুরু একবার তাই লিখেছিলেন ঃ

"···কিসের শব্দে ঘুম ভেঙে গেল যেই,
দেখি কলিকাতা আছে কলিকাতাতেই ॥"

কলকাতা তাই কখনও পুরানো হয় না, মিছিল নগরী কলকাতা হয়তো তাই একদিন হয়ে উঠবে 'কল্লোলিনী কলকাতা'।

কলকাতার এতো নিন্দুকের অভাব না হলেও একটা আশ্চর্য কথা হয়তো লক্ষ্য করেছো ?

কথাটা কি বলতে পারো ? হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছো, কলকাতার এতো বদনাম থাকা সত্ত্বেও সবাই তবু ছুটে আসে এই শহরটায়—তাদের রুজি রোজগারের ধান্দায়। এখানে রাস্তায় বসে হকারের হাট, যানবাহন হয় বাদুর ঝোলা—আর তারই সমাধানের পথ খুঁজতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত কলকাতায় তাই শুরু হয়েছে আধুনিক পাতাল রেলের শুভ জয়যাত্রা।

পাতাল রেলের ভাবনা তাহলে কবে শুরু হয় ?

বেশ কিছুকাল আগেই এ ভাবনা সরকারকে ভাবতে হয়েছিল। কলকাতা শহরের যানবাহন সমস্যা এমনই এক জটিল পর্যায়ে এসে পেঁছে যায় যে নতুন কিছু একটা পথ আবিষ্কারের চেষ্টা ছাড়া পথ ছিলো না।

আর সেই কারণেই সরকার ভেবেছিলেন অনেক কিছু। তার মধ্যে ছিলো মনোরেল আর চক্ররেল বা সার্কুলার রেল পথের ভাবনাও। কিন্তু শেষ অবধি ঠিক করা হলো পাতাল রেলই হবে এর যোগ্য সমাধান। পরে অবশ্য চক্ররেল পথও চালু হয়েছে।

আর এই উদ্দেশ্যেই বিদেশের মতামতও চাওয়া হলো। ইংল্যান্ড আর ফ্রান্সের কিছু সমীক্ষক কলকাতার সব কিছু খতিয়ে দেখে বলেছিলেন কলকাতায় পাতাল রেল বা টিউব রেল সম্ভব নয়—কারণ এখানকার মাটী নরম, তাছাড়াও প্রচুর সমস্যা। এ প্রকল্প বোধ হয় বাতিল করাই ভালো।

কিন্তু দমলেন না সরকার আর পরিকল্পনা কমিশন। তারা বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মেট্রো রেলপথ বা পাতাল রেল বিশেষজ্ঞ দেশ রাশিয়ার পরামর্শ চাইলেন।

কলকাতার সৌভাগ্য আর গর্ব রুশ সমীক্ষক দল সব কিছু পরীক্ষার পর জানালেন কলকাতায় পাতাল রেল চালু করার কোন অসুবিধাই নেই—নিশ্চয়ই তা হতে পারে। তারা তাদের প্রতিবেদন দাখিল করলেন। সরকারও তা গ্রহণ করলেন।

সরকারও হাঁফ ছাড়লেন—পাতাল রেল না হলে যে কলকাতার জটিল এই যানবাহন সমস্যা কিছুতেই মেটানো যেতো না। আর কলকাতা শহরেই তো হবে ভারতীয় পাতাল রেল প্রকল্পের শুভ উদ্বোধন। এরপর একে একে চালু হবে তা বোম্বাই, মাদ্রাজ আর দিল্লীতেও।

পাতাল রেলের প্রস্তাব এবার পাকাপাকি ভাবেই গৃহীত হয়ে গেলো।

কিন্তু একটা কথা।

কথাটা কি জানো? কথাটা হলো, শুধু প্রস্তাব গ্রহণ করলেই তো আর কাজ শেষ হলো না। এর সঙ্গে জড়িত ছিলো হাজারও সব সমস্যা—টাকার সমস্যা, কাজ করার সমস্যা, বিদেশী জিনিসপত্রের সমস্যা, কারিগরী জ্ঞানের সমস্যা, আরও কত কি।

কিন্তু কোন শুভ কাজেই বাধা আর বাধা থাকে না।

এক্ষেত্রেও তাই হলো। পরিকল্পনা কমিশন টাকা মঞ্জুর করলেন। ধরা হলো, ১৯৭২ সালে কাজ শুরু হলে শেষ হতে ১৯৮৪ নাগাদ আর মোট ব্যয় হবে ২০০০ কোটি টাকার কাছাকাছি। ১৯৭৮ সালে শুরু হবে টালীগঞ্জ থেকে গড়িয়া, দমদম থেকে শুরু হয়ে। এরপরে হাতে নেওয়া হবে লবণ হ্রদ বা সল্ট লেক থেকে রামরাজাতলা পর্যন্ত রেল পথের কাজ। মোট খরচ প্রায় ৩০০০ হাজার কোটি টাকা।

প্রথম কাজ শুরু হবে দমদম থেকে টালীগঞ্জ অবধি রেলপথের। কলকাতার পাতাল রেলপথের জন্য পরামর্শ দিয়েছিলেন মস্কোর টেকনো এক্সপোর্ট। আর সরকার কলকাতার এই মেট্রো অর্থাৎ পাতাল রেলের কাজ সুষ্ঠুভাবে করার জন্য গঠন করলেন একটি সংস্থা—ক্যালকাটা মেট্রোপলিটান ট্রান্সপোর্ট প্রজেক্ট।

কলকাতা খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়েই হেঁটে চলেছে এখনও। কলকাতা শহরটার পা মানে তো তার সব যানবাহন, তাই তারাই যদি ঠিক মত না চলে কলকাতা

চলবে কি করে ? তাই মেট্রো রেলের কর্তৃপক্ষ বিজ্ঞাপন দিয়ে জানিয়ে দিলেন কলকাতার পায়ে তাঁরা জুড়ে দিতে চান ডানা—সেই ডানায় ভর করেই কলকাতা হবে গতিশীল।

কিন্তু সে কথা যাক। আমরা এবার দেখে নিই এসো, পাতাল রেল চালু করার জন্য যে বিপুল কর্মযজ্ঞ শুরু হলো তার পরিণতি কোথায়। কবে চালু হয় সেই চির আকাঙ্খিত রেল পথ আর মানুষ হয়ে ওঠে গতিময়। এর সঙ্গে সঙ্গে আরও জেনে নিতে পারবো এই রেল প্রকল্পের আরও সব জ্ঞাতব্য তথ্য— এর দৈর্ঘ্য কত, কতগুলো স্টেশনই বা আছে আর কোথায়, কতই বা এর ভাড়া আর তার যাত্রী সংখ্যা, এই রকম আরও কত অন্যান্য তথ্য।

পাতাল রেলপথের দৈর্ঘ্য ঠিক হয় প্রায় ১৭ কিলোমিটার (সঠিক ১৬.৩২ কি.মি.) দমদমে শুরু হয়ে এটা শেষ হবে টালিগঞ্জে।

আর কতগুলো স্টেশন ?

হ্যাঁ, এবার সেটাই দেখা যাক, এসো।

ষ্টেশন থাকবে মোট টালিগঞ্জ পর্যন্ত ১৭টা। আর গড়িয়া পর্যন্ত চালু হলে ষ্টেশন দাঁড়াবে ২৪টা। আর যে সব ষ্টেশনের নাম হলো এই রকম ঃ

দমদম, বেলগাছিয়া, শ্যামবাজার, শোভাবাজার, গিরীশ পার্ক, মহাত্মা গান্ধী রোড, সেণ্ট্রাল, চাঁদনী চক, এসপ্লানেড, পার্কস্ট্রীট, ময়দান, রবীন্দ্রসদন, ভবানীপুর, যতীনদাস পার্ক, কালিঘাট, রবীন্দ্র সরোবর, টালিগঞ্জ, চণ্ডীতলা, কুদঘাট, বাঁশদ্রোনী, নাকতলা, রথতলা (গড়িয়া বাজার), কালীতলা (প্রণব নগর), গড়িয়া। গড়িয়া পর্যন্ত পাতাল রেল চলবে ঠিক করা হলেও আপাতত এটা কিন্তু হবে দমদম থেকে টালীগঞ্জ পর্যন্তই।

১৭টা ষ্টেশনের মধ্যে প্রথমে মাটির নিচে থাকবে ১৬টি আর উপরে একটি। ট্রেনের গতি বেগ হবে সবচেয়ে বেশি ঘণ্টায় ৮০ কি.মি. আর গড়ে ৩৩ কিলোমিটার।

এক একটা ট্রেনে থাকবে ৮টা করে কামরা আর ৪৬ জন যাত্রী হিসেবে মোট যাত্রীর সংখ্যা হবে ২৭৩ জন থেকে ২৮৯ জন।

কি রকম যাত্রী বহন করবে পাতাল রেল বা এই ভূগর্ভ রেল ?

বেশ ভালো প্রশ্ন। কারণ, এটা জানাই সবচেয়ে জরুরী যেহেতু যাত্রী পরিবহন সমস্যা মেটাবার জন্যই তো পাতাল রেল চালু করা হচ্ছে।

হিসেব করে দেখা গেছে ১৯৮৩ সালে ট্রেন চালু হলে যাত্রী থাকবে সপ্তাহে ১.৫৩ (দশ লক্ষের হিসেবে) আর ১৯৮৫ সালে ১.৫৭ (দশ লক্ষ হিসেবে) আর ১৯৯০ সাল নাগাদ ১.৭৩ (দশ লক্ষ হিসেবে)।

প্রতি ঘণ্টায় ১৯৮৩ সাল নাগাদ যাত্রী হবে ৬০,০০০ হাজার। আর ১৯৯০তে তা দাঁড়াবে ৬৭,০০০ হাজারে।

সারা ট্রেনে কিন্তু থাকবে এক রকম শ্রেণীরই ব্যবস্থা। এক একটা কামরার

দৈর্ঘ্য হবে ২০·৩ মিটার, চওড়ায় ২·৭৪ মিটার আর উচ্চতা হবে ৩·৫৫ মিটার।

আর কতগুলো করে ট্রেন চলবে ?

ট্রেন চলবে ১৯৮৩ সাল নাগাদ ২৮ জোড়া—প্রয়োজনের সময় অর্থাৎ অফিস টাইমে। আর ১৯৯০ সাল নাগাদ তার সংখ্যা দাঁড়াবে ৩১ জোড়া।

প্রতিদিন ট্রেন চলবে ১৯৮৩—৩৭৪, ১৯৯০—৪২৯।

ট্রেনে সিগন্যালিং ব্যবস্থা হবে স্বয়ংক্রিয়। বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা আর তাপমাত্রা থাকবে ৩০° সেণ্টিগ্রেড বা সেলসিয়াস। বেতারে কেন্দ্রের সঙ্গে টেলিকমিউনিকেশন যোগ থাকবে। আর থাকবে ক্লোজ সার্কিট টেলিভিসন ব্যবস্থাও।

এই ট্রেন চলবে বিদ্যুতে। দরকার মত তাই পাতালরেলের থাকবে নিজস্ব পাওয়ার স্টেশন। এই ট্রেন চালাতে দরকার হবে ১২·৮ এম· ভি· এ· শক্তি।

টিকিট কাটার জন্যও থাকবে স্বয়ংক্রিয় টিকিট দেওয়ার যন্ত্র।

কিন্তু ভাড়া কত হবে ?

হ্যাঁ, এটাও দরকারী কথা বটে।

যা জানা গেছে, কম পক্ষে ভাড়া দাঁড়াবে এক টাকার কাছাকাছি। এই পাতাল রেল মাটির কত নিচু দিয়ে তাহলে যাবে ?

হ্যাঁ, চমৎকার একটা প্রশ্ন।

এর উত্তর হলো, মাটির ৯·৬৫ মিটার নিচেই থাকবে প্ল্যাটফর্ম আর রেল লাইন। এক একটা ষ্টেশনে প্ল্যাটফর্ম থাকবে ১টা করে পাশে। আর কেন্দ্রীয় বা সেণ্ট্রাল ষ্টেশনে থাকবে দুটো প্ল্যাটফর্ম—পাশের দিকেই। প্ল্যাটফর্মের দৈর্ঘ্য হবে ১৭০ মিটার। দমদম স্টেশনে প্ল্যাটফর্ম থাকবে দুটো, মোট লাইনের দৈর্ঘ্য হবে ৩৭·৭২ কি· মি।

এবার দেখতে পারা যেতে পারে কলকাতার এই পাতাল রেল প্রকল্পের কাজ শুরু হয় কোন পদ্ধতিতে।

এ প্রশ্নের উত্তর পেতে হলে একটু দুনিয়ার নানা দেশের মেট্রো রেলপথ তৈরির ইতিহাস আর পদ্ধতির কথাটা আর একবার জানা দরকার।

পাতাল রেল প্রথম চালু হয় লণ্ডন শহরে এ আমরা আগেই দেখে নিয়েছি। লণ্ডনে কাজ হয় 'কাট অ্যাণ্ড কভার' অর্থাৎ 'কাটো এবং ঢাকো' পদ্ধতিতে। কলকাতার ভূগর্ভ রেলের কাজে ওই পদ্ধতি গ্রহণের সুপারিশ করেন রুশ বিশেষজ্ঞ দল। মাটি কাটার পর চারপাশে 'রিইনফোর্সড্ কংক্রিট' অর্থাৎ কংক্রিটের ঢালাইয়ে বাক্স বানানোর কাজই চলে। আর এর সঙ্গে সঙ্গে টানেল বা সুরঙ্গে ঢালাই লোহার খাঁচাও বানানো হয়। এর দৈর্ঘ্য ১·০৮১ কি·মি·। এইভাবে টানেল আর ডায়াফ্রাম ওয়াল বা দেওয়াল তৈরি করার পর উপরে আবার রাস্তাও বানানো হয়ে চলে।

কলকাতার পাতাল রেল প্রকল্পের কাজ শুরু হয় ১৯৭২ সালে। এই কাজ

করার জন্য ভারতীয় ইঞ্জিনিয়াররা প্রাণপাত পরিশ্রমও করে চলেছেন। অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্য তারা ঘুরেছেন দেশে দেশে—লণ্ডন, প্যারী, মস্কো, লেনিনগ্রাদ আরও কতদেশে। সেটা সেসব দেশের পাতাল রেল দেখতেই।

কলকাতার পাতাল রেল কি তাহলে আমাদের পরিবহন সমস্যা সত্যিই আজ মেটাতে পারবে ?

সেটা একটু দেখা যাক। প্রশ্নটা কিন্তু বেশ কঠিনই বলতে হয়।

পাতাল রেল চালু হলে যা হতে পারে, সেটা এই রকম ঃ

কলকাতার রাস্তা দিয়ে প্রতি ঘণ্টায় কত যাত্রী চলাচল করে সেটা হিসেব করে দেখা গেছে, বাসে সেটা প্রায় পাঁচ হাজার। ট্রামেও মোটামুটি তাই। সেখানে পাতাল রেল যাত্রী পরিবহন করবে প্রায় পঞ্চাশ হাজারের মত।

দমদম থেকে টালীগঞ্জ পেঁছিতে পাতাল রেলের সময় লাগবে ৩৩ মিনিট। দমদম থেকে ধর্মতলা পর্যন্ত ৮.৯ কি.মি. পথ পাড়ি দিতে লাগবে মাত্র ১৮ মিনিট আর ধর্মতলা থেকে টালীগঞ্জ যেতে লেগে যাবে ১৫ মিনিট মাত্র। এই দূরত্ব ৭.৫৫ কি.মি.।

পাতাল রেল কি তাহলে সারা কলকাতাতেই একই সঙ্গে চালু হওয়ার কথা ছিল।

না, তা কিন্তু নয়।

পাতাল রেল কর্তৃপক্ষ অবশ্য বলেছিলেন কলকাতায় পাতাল রেল তারা চালু করবেন ১৯৮৩ সালে। আর প্রথম ট্রেন চলবে দুটো ভাগে—(১) দমদম থেকে শ্যামবাজার (২) ধর্মতলা থেকে টালীগঞ্জ। এর কারণ হল, সব খোঁড়াখুঁড়ি আর টানেল তৈরির কাজ শেষ হবে না বলেই। এ কাজে অসুবিধা যে ঢের, তাই।

এবার তাহলে আমরা একটু দেখে নিতে পারি কলকাতা শহরের বুকে পাতাল রেল প্রকল্প নামের বিশাল ওই পরিকল্পনাটি কি ভাবে কতখানিই বা রূপায়িত হতে পেরেছে আর সম্পূর্ণ হতে কতটাই বা বাকি।

পাতাল রেল বা মেট্রোর ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন সে সময়কার ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী ১৯৭২ সালের ২৯শে ডিসেম্বর। প্রকল্পের কাজ আরম্ভ হয় ১৯৭৩-৭৪ সালে।

কলকাতার পাতাল রেলের কাজ প্রথমেই শুরু হল দমদম-বেলগাছিয়া এলাকায়। দমদম থেকে বেলগাছিয়া পর্যন্ত ট্রেন চালানো হয় মাটির উপর দিয়েই। বেলগাছিয়াতেই পাতালে প্রবেশ করার ব্যবস্থা হয় পাতাল রেলের। সেখান থেকেই তাই শুরু হয় টানেল তৈরির কাজ। কাজে লেগে পড়ে হাজার হাজার শ্রমিক আর নানা প্রতিষ্ঠান। কাজে লাগানো হয় লক্ষ লক্ষ টন সিমেণ্ট আর লোহা। সারা কলকাতাই যেন হয়ে ওঠে বিরাট এক কর্মশালা। এতো এক আধজনের কাজ নয়, তাই বহু প্রতিষ্ঠানও এই কর্মযজ্ঞে অংশ নেয় যেমন

হিন্দুস্তান কনস্ট্রাকশন, ন্যাশানাল প্রোজেক্ট কনস্ট্রাকশন করপোরেশন, হিন্দুস্তান বিল্ডার্স' এমন আরও কত প্রতিষ্ঠান। এ মানুষের স্বেদ শ্রমেরই কাহিনী। 'কাট অ্যান্ড কভার' পদ্ধতিতে বানানো হল খাঁচা বা টানেল।

এই বিরাট কর্মযজ্ঞ যেন বিশ্বকর্মার আশীর্বাদ হয়ে নেমে আসে। কত লক্ষ লক্ষ শ্রমিক আর কর্মচারির রুজি রোজগারের পথও খুলে যায়। চওড়া করতে হয় কত পথ, দিতে হয় কোটি কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ, ঘুরিয়ে দিতে হয় যাতায়াতের পথ। ক্ষতিগ্রস্ত হয় কত বাড়ি আর দোকান। কেটে ফেলা হয় কত সুন্দর সবুজ গাছ।

কিন্তু এত বাধা, অসুবিধা আর কষ্ট কলকাতার মানুষ হাসি মুখেই মেনে নেয় শুধু ভবিষ্যৎ সুখের আশায়। সে আশা সত্যিই পূর্ণ হয়েছে কলকাতা-বাসীর। ভারতের প্রথম পাতাল রেল কলকাতাতেই যে চালু হয়েছে।

কিন্তু দমদম থেকে টালীগঞ্জ পর্যন্ত রেলপথ এখনও একটানা চালু হতে পারেনি।

তাহলে ?

হ্যাঁ, এবার সেই কথাই বলছি।

সবচেয়ে প্রথমে পাতাল রেল চলতে শুরু করে সেই কথাটাই আগে বলি। সর্বপ্রথম কলকাতায় পাতাল রেল চালু হয় এসপ্লানেড থেকে ভবানীপুর পর্যন্ত ৪ কিলোমিটার পথে। এই বিরাট কর্মযজ্ঞের চেহারা দেখেছে মানুষ, অর্থাৎ কলকাতাবাসী। সারা শহরে চলেছিল খোঁড়াখুঁড়ি। ট্রাম লাইন বন্ধ করে দিতে হয় ধর্মতলা থেকে ভবানীপুরের হাজরা মোড় পর্যন্ত। ভবানীপুরের ট্রাম চালানো হয় আলিপুরের লাইন দিয়ে। সারা ময়দানে যেন গড়ে ওঠে ছোট বড় মাটির পাহাড়। দশ বছর ধরে হাসিমুখে সমস্ত কষ্ট সহ্য করেছে কলকাতার মানুষ। ধর্মতলা থেকে আবার ট্রাম চালু করা হয় বিড়লা প্ল্যানেটোরিয়াম পর্যন্ত। ভবানীপুরে অবশ্য ট্রাম এখনও চালু হয়নি।

কিন্তু পাতাল রেলের সেই বহু আকাঙ্ক্ষিত শুভ উদ্বোধন কবে হল ?

সেকথাই এবার জানাই।

ভারতের বুকে সেই প্রথম পাতাল রেল বা মেট্রো চালু হয় কলকাতায় ১৯৮৪ সালের ২৪ অক্টোবর তারিখের এক শুভ মুহূর্তে। এই ট্রেন চলেছিল এসপ্লানেড স্টেশন থেকে যাত্রা আরম্ভ করে ভবানীপুর পর্যন্ত।

এর মাঝখানে কোন কোন স্টেশন ছিল ?

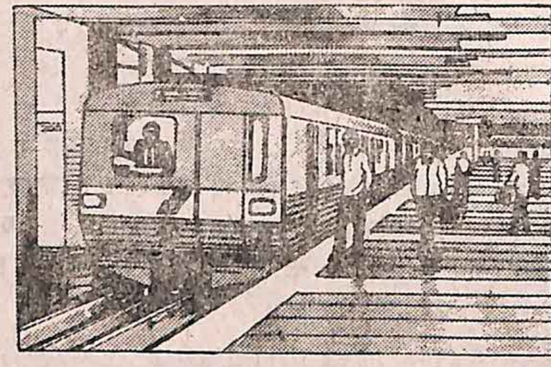
এই ৪ কিমি. দূরত্ব পথের মাঝখানে স্টেশন ছিল মোট পাঁচটি ঃ এসপ্লানেড থেকে শুরু করে পরপর পার্ক স্ট্রীট, ময়দান, রবীন্দ্রসদন আর ভবানীপুর।

এই রেলপথে ভাড়া কেমন ? হ্যাঁ, সেটাও তো জানতে হবে।

ভাড়া এসপ্লানেড থেকে ভবানীপুর পর্যন্ত একটাকা। ভবানীপুর পেঁছতে সময় লাগে ৮ মিনিটের মত। ট্রেন চলে কখনও চারটি কামরা নিয়ে

কখনও আটটি নিয়ে।

চমৎকার ওই বগি বা কামরা। ঢোকার পর মুহূর্তেই দরজা হয়ে যায় বন্ধ। সবটাই স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থায়। মাইক্রোফোনের সাহায্যে যাত্রীদের আগেই সতর্ক করে দেওয়াও হয়।



মেট্রো রেল

পাতাল রেলের স্টেশনগুলো ভারি সুন্দরভাবে সাজানো। ঝকঝকে তকতকে সিঁড়ি। ভিতরে চমৎকার বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা। স্টেশনের প্লাটফর্মও চমৎকার। সবচেয়ে তারিফ করার মত স্টেশন পার্ক স্ট্রীট। বিদেশীরাও উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন পাতাল রেল ব্যবস্থার।

প্রথম শুভ উদ্বোধনের দিন কলকাতাবাসী প্রায় হুমড়ি খেয়েই পড়েছিল পাতাল রেলে বেড়িয়ে আসার জন্য। সে এক উৎসবের দিনই হয়ে উঠেছিল, কোন সন্দেহ নেই।

কিন্তু, তারপর ?

হ্যাঁ, ভবানীপুর পর্যন্ত চালু থাকার পর পাতাল রেল কর্তৃপক্ষ আবার ঘোষণা করলেন ভবানীপুর থেকে রেলপথে আবার রেল চলবে আরও দূর অর্থাৎ টালীগঞ্জ পর্যন্ত। সে পথের কাজও ততদিনে যে শেষ হয়েছিল।

এরমধ্যে অবশ্য আরও একটা ঘটনা ঘটেছিল। আর তা হল দমদম থেকে বেলগাছিয়া পর্যন্ত রেলপথেও চলতে শুরু করে পাতাল রেল। এই যাত্রা শুরু হয় ১৯৮৪ সালের ১২ই নভেম্বর তারিখে দু কিলোমিটার পথে। দমদম থেকে বেলগাছিয়া কিন্তু টানেল নেই, এপথে ট্রেন চলেছে মাটির উপর দিয়েই।

এইভাবেই মোট ১৬'৪৩ কিলোমিটার পথের মোট প্রায় দশ কিলোমিটার পথেই চলতে শুরু করেছে পাতাল রেল বা মেট্রো রেল।

ব্যাপারটা হল এই :

উত্তরে দমদম থেকে বেলগাছিয়া পর্যন্ত মোটামুটি ২ কিমি., এসপ্লানেড

থেকে টালীগঞ্জ ৮ কিমি.। মাঝখানে শুধু বাকি রইল বেলগাছিয়া থেকে চাঁদনীচক হয়ে এসপ্লানেড।

কিন্তু একটা ফাঁক রয়ে গেছে লক্ষ্য করেছ নিশ্চয়ই।

হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছ। ভবানীপুর থেকে টালীগঞ্জ রেলপথে কবে ট্রেন চলল সেকথা বলা হয়নি। এবার সেকথাই।

টালীগঞ্জ পর্যন্ত পাতাল রেল চালু হয় ১৯৮৬ সালের ২৯শে এপ্রিল। এই পথটায় স্টেশন রয়েছে কি কি ?

হ্যাঁ, এটা অবশ্যই জানা দরকার।

ভবানীপুরের পরের স্টেশন হল হাজরা পার্ক বা যতীনদাস পার্ক স্টেশন। এরপর কালীঘাট, রবীন্দ্র সরোবর আর টালীগঞ্জ।

এই পথের ভাড়া কেমন। হ্যাঁ, এবার সেকথা। এসপ্লানেড থেকে যতীনদাস পার্ক পর্যন্ত ভাড়া বর্তমানে এক টাকা, টালীগঞ্জ পর্যন্ত দেড় টাকা। আবার যতীনদাস পার্ক থেকে টালীগঞ্জ হল একটাকা, এই হিসেবে। সময় লাগে যতীনদাস পার্ক থেকে টালীগঞ্জ মোটামুটি আট মিনিট।

আরও একটা সুন্দর জিনিস উপহার দিয়েছেন পাতাল রেল কর্তৃপক্ষ কলকাতাবাসীকে। জিনিসটা কি বলতে পারো ?

হ্যাঁ, ঠিক বলেছ, এসকালেটার বা বৈদ্যুতিক সিঁড়ি।

বিদেশে এই সিঁড়ি প্রায় সবদেশেই রয়েছে। যাত্রীদের চট করে সহজে ওঠানামা করার জন্যই এই এসকালেটার বা বৈদ্যুতিক সিঁড়ি। কলকাতায় পাতাল রেলের প্রথম এই সিঁড়ি বসানো হয়েছে এসপ্লানেড স্টেশনে। এ এক ভারি মজার ব্যাপার।

শোনা গেছে বাকি সমস্ত স্টেশনেও আস্তে আস্তে এই বৈদ্যুতিক সিঁড়ি বসানো হবে। এতে নিশ্চয়ই যাত্রীদের পরিশ্রম বেশ কমবে তাতে সন্দেহ নেই। এর কারণ হল পাতাল রেলে উঠতে বা নেমে মাটির উপরে আসতে বেশ কিছু সিঁড়ির ধাপ পার হতে হয়। এই পথ বেশ কয়েকটা তল তো হবেই। এই পাতাল রেল চলে মাটির প্রায় ৬০ ফিট নিচে।

কিন্তু এ আমরা কলকাতাবাসীরা মেনে নিয়েছি, তাই না ? পাতাল রেল চালু হওয়ায় কলকাতা গর্ব করতে শিখেছে। কলকাতা আজ বিশ্বের পাতাল রেলের মানচিত্রে পাকাপাকি জায়গা করে নিতে পেরেছে যে।

চলার শেষে পাতাল রেল রাত কাটাবে কোথায়। হ্যাঁ, তার ব্যবস্থাও ঠিক নেওয়া হয়েছে। পাতাল রেলের আশ্রয় নেবার জায়গা বা কার শেড তৈরি হয়েছে উত্তরে দমদম আর দক্ষিণে টালীগঞ্জে।

মোটামুটি তাহলে দাঁড়াল কি ?

দাঁড়াল এই যে আমরা পাতাল রেলের যুগে প্রবেশ করেছি, সমাধান করতে পেরেছি যানবাহন চলাচলের বা পরিবহনের সমস্যা।

এস্‌প্লানেড থেকে টালীগঞ্জ রেলপথের যাত্রীদের সুবিধার জন্য দশ থেকে বিশ মিনিট অন্তর চলতে শুরু করেছে ট্রেন। বর্ষা বাদল ঝরা দিনে যখন অন্য যানবাহনের দেখা মেলেনা তখনও চলেছে এই পাতাল রেল। এটা কি কম আশার কথা।

কিন্তু সে কথা থাক। পুরো পথের যাত্রা শুরু হবে কবে? অর্থাৎ সেই দমদম থেকে দক্ষিণের টালীগঞ্জ?

হ্যাঁ, এবার সেকথাই জানা যাক।

আসলে ব্যাপারটা হল এই পথে সমস্যা অনেকটাই। এই অংশে কাজের পদ্ধতিও তাই কিছুটা আলাদাও বটে। বেলগাছিয়া থেকে শ্যামবাজার পর্যন্ত কাজ যেমন এগিয়ে চলেছে উত্তর থেকে দক্ষিণে তেমনই আবার কাজ চলেছে এস্‌প্লানেডের চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ থেকে উত্তরমুখী হয়ে। পথ চলতি মানুষ দেখতে পায় বিশাল উঁচু সব ক্রেন, লোহার বড় বড় বিম নিয়ে কাজ চলেছে।

এই অংশ দুটোর কাজ বেশ কঠিন। এই পথে বেলগাছিয়া থেকে শ্যামবাজার পর্যন্ত বসানো হচ্ছে দুটো টানেল বা সুরঙ্গপথ। দুটো টানেলের প্রতিটির দৈর্ঘ্য কত জানো? প্রায় ৮০০ মিটার লম্বা প্রত্যেকটি, মাটির ৬০ ফিট নিচে তৈরি হচ্ছে এই টানেল। এই টানেল বানানোর সময় সার্কুলার ক্যানাল বা খালের নিচ দিয়ে নিয়ে আসা হয়েছে। কারিগরী দক্ষতার এ এক চমৎকার দৃষ্টান্ত। আর এজন্য আমরা সকলেই গর্বিত, তাই না? কেননা এসব কাজ করেছেন আমাদেরই দেশের ইঞ্জিনীয়ার আর শ্রমিকরা। শ্যামবাজার থেকে বিবেকানন্দ রোড অবধি ৩ কিলোমিটার পথের কাজ ইতিমধ্যেই শেষ।

আগেই বলেছি এই অংশের কাজ বড় কঠিন। মাটির নিচে এখানে বানানো হয়েছে কংক্রিটের জটিল বাক্স। একাজ কোন প্রতিষ্ঠান করছে জানো?

একাজ করছে ভারতের গর্ব হিন্দুস্তান কনস্ট্রাকশন কোম্পানী, বিখ্যাত এক জাপানী প্রতিষ্ঠান তাইসেই কর্পোরেশনের সহযোগিতায়।

পাতাল রেলের পুরো পথটায় ট্রেন চলার আর বেশি দেরী নেই। পাতাল রেল কর্তৃপক্ষ ঘোষণা করেছেন ১৯৯১ সালের মধ্যেই তা সম্ভব হবে। তার মানে দমদম থেকে টালীগঞ্জ রেলপথের পুরোটাই চালু হয়ে যাবে।

বিশাল, ব্যাপক এই কর্মযজ্ঞে কত খরচ হবে জানো কেউ?

হ্যাঁ, টাকাটা বেশ ভাল রকমই খরচ হয়েছে বা হবে। মোট খরচ আপাতত হয়তো দাঁড়াবে ৮০০ কোটি টাকায়। কিন্তু এ খরচ সার্থক। কলকাতার লক্ষ লক্ষ মানুষের যে উপকার করতে পেরেছে পাতাল রেল সে তুলনায় এ খরচ ধর্তব্যই নয়। পাতাল রেলের কাজ সম্পূর্ণ হলে খরচ হয়তো দাঁড়াবে ২০০০ কোটি টাকায়।

কতলোক চলাচল করবে পুরো পাতাল রেলে যাত্রাপথে?

প্রত্যেকদিন গড়ে প্রায় দশ লক্ষ সত্তর হাজার মানুষ যাতায়াত করবে ঘণ্টায় প্রায় ৬০০০০ হাজার যাত্রী হিসেবে পাতাল রেলে। অংকটা বিরাট, তাই না?

শুধু পরিবহন সমস্যাই মেটাচ্ছে না পাতাল রেল, কলকাতার আকাশ-বাতাসে দূষণের যে মাত্রা আজ ভয়ানক ভাবে বেড়ে উঠেছে পাতাল রেল তা থেকেও মুক্ত রাখছে যাত্রীদের। এটা কম কথা নয়।

পাতাল রেলের জন্য সরকার গঠন করেছেন স্বয়ংশাসিত সংস্থা এম. টি. পি বা মেট্রো রেল দপ্তর। এই দপ্তরের বিশাল ভবনটি তৈরি হয়েছে চৌরঙ্গী রোডের উপর পার্ক স্ট্রীটের কাছে।

আরও কিছু গর্বিত হওয়ার মত কাজ করেছে পাতাল রেল কলকাতার জন্য। সেটা কি কেউ বলতে পারো?

ঠিক ধরেছে, পাতাল রেল চমৎকার ভাবে সাজিয়ে দিয়েছে কলকাতার ময়দানের বেশ কিছু অংশ। খোঁড়াখুঁড়ির ফলে ময়দান যে এক সময় বিশ্রী রূপ নিয়েছিল আজ আর সে রূপ নেই। চমৎকার ফুলের কেয়ারীর সঙ্গে পাঁচিল দিয়ে ঘিরে দেওয়া হয়েছে ময়দানের অনেকটা। জলাশয়গুলোও সাজানো হয়েছে দেখার মত করে। চৌরঙ্গী উপর দিয়ে যাওয়ার সময় চমৎকার ময়দানের রূপ আমাদের খুশি হতে সাহায্য করে তাতে সন্দেহ নেই।

কলকাতার যানবাহনের মোটামুটি বিবর্তনের ইতিহাসটা তাহলে জেনে ফেলা গেল কি বল?

কিন্তু সমস্যার সমাধান পরোপুরি হতে পারেনি এতেও।

কারণ কি জানো? কারণ, যেকথা আগেই বলেছি সেই 'কলকাতা চল' এই মনোভাব। কলকাতা সম্পর্কে বোধহয় কবির ভাষাতেই বলা যায়:

'…দিবে আর নিবে
মেলাবে মিলিবে
যাবে না ফিরে…'

কলকাতা সত্যিই এক মহান শহর। এ শহর সকলকেই কাছে টেনে নেয়, সবার রুজি রোজগারের পথ বাতলে দেয়। কলকাতা এমনই শহর যেখানে আজ কোটিপতির প্রাসাদের পাশেই থাকে নোংরা ঝুপরি। এ এমনই শহর যেখানে রোজ যেমন হাজার টাকাতেও জীবন কাটে তেমনই এখনও দৈনিক দুটাকাতেও বুঝি মানুষ বেঁচে থাকে। এমন শহর ভারতের আর কোথাও নেই।

এই কারণেই কলকাতায় মানুষের অবিরাম স্রোত। আর তাই দেখা দেয় পরিবহন সমস্যা। রোজ দশ থেকে পনেরো লক্ষ মানুষ আসে শহর কলকাতায়, তাদের পরিবহনের ব্যবস্থা তাই হয়ে ওঠে অপ্রতুল তাই না?

যেদিন কলকাতার পরিবহন সমস্যা মেটানোর উদ্দেশ্য নিয়ে সরকার

পাতাল রেলের কথাটা ভেবেছিলেন সেদিনও বিশেষজ্ঞরা বলেছিলেন একটা কথা।

কথাটা মনে পড়ছে ?

হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছ, পাতাল রেল চালু করার সঙ্গে চালু করা চাই চক্ররেল প্রকল্প, একথাই বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছিলেন সেদিন।

সরকারী বিশেষজ্ঞরা তাই তাদের সেকথা অগ্রাহ্য করেন নি। তারা মনস্থ করেছিলেন পাতাল রেল চলার সঙ্গে চক্ররেল ব্যবস্থাও গড়ে তুলতে হবে।

একাজে তেমন জটিলতা ছিল না বলেই কাজটিও সহজ হয়ে গেলো।

হ্যাঁ, ঠিকই ভেবেছো তোমরা। চক্ররেল চালানোর জন্য তেমন খরচের সম্ভাবনা মোটেই ছিল না। চক্ররেলের কাজ শুরু করতে তাই দেরী হল না। এর লাইন আগেই ছিল।

এ লাইন কোথায় জানো ? ইডেন গার্ডেন ছাড়িয়ে গঙ্গার ধার বরাবর মালগাড়ি চলাচলের এই লাইনেই চক্ররেল চালানো হবে ঠিকও হয়ে যায়।

এই লাইন চলে গেছে ঘুরে একেবারে উত্তরে বাগবাজার ছাড়িয়ে।

সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে কাজও আরম্ভ হয়ে যায় অচিরেই। লাইন মেঝে-ঘষে ফেলাও হল। ঠিক হল বাগবাজার থেকে এই রেলপথে একজোড়া ট্রেন চালানো হবে গঙ্গার ধার বরাবর প্রিন্সেপ ঘাট অবধি। এটাই হবে চক্ররেল।

শেষ পর্যন্ত চক্ররেল চালু হয়ে যায় কবে জানো ?

হ্যাঁ, এটাও বেশ মজার। পাতাল রেল চলতে শুরু করার আগেই চলতে শুরু করেছিল চক্ররেল।

চক্ররেল চলতে আরম্ভ করে ১৯৮৪ সালের আগস্ট মাস থেকে, পাতাল রেল চলে ওই বছরই অক্টোবর মাস থেকে এটাতো আগেই জেনে নিয়েছো।

চক্ররেল অফিস যাত্রীদের দারুণ সুবিধাও করে দিতে পেরেছে সন্দেহ নেই। এই রেলপথ এখন চলে গেছে পুব দিকে প্রায় সল্টলেকের মুখে। এজন্য কটি স্টেশনও গড়ে উঠেছে। চক্ররেল পথে বিধাননগর থেকে সাত কিলোমিটার পথ পেরিয়ে যাত্রা বিরতি করছে ইডেন উদ্যানের পশ্চিমে প্রিন্সেপ ঘাটে।

চক্ররেলের এই সাত কিলোমিটার পথে কি কি স্টেশন আছে ?

ভালো প্রশ্ন। এবার সেটাই দেখা যাক।

পশ্চিমে প্রিন্সেপ ঘাট থেকে পরপর রয়েছে ইডেন গার্ডেনস, বি.বা.দী. বাগ, বড় বাজার, শোভাবাজার-আহাড়ীটোলা, বাগবাজার, টালা ও বিধাননগর।

চক্ররেলের ভাড়া কিন্তু দেড় টাকা, তা যেখান থেকেই ট্রেনে উঠি না কেন। শহরের প্রান্ত ছুঁয়ে চলে যায় চক্ররেল পশ্চিম থেকে পুবে, আর পুব থেকে পশ্চিমে।

ডালহাউসী বা এসপ্লানেডে আসতে উত্তরের মানুষে চমৎকার সুবিধা করে দিতে পেরেছে এই চক্ররেল, তাই এটা জনপ্রিয়ও হয়ে উঠেছে।

আমরা এতক্ষণে সত্যিই কলকাতার যানবাহনের রূপ বদলের চেহারাটা ভালই বুঝে নিতে পেরেছি তাই না ?

কলকাতার তিনশ বছর পূর্তির আর দেরী নেই। আগামী ১৯৯০ সালের ২৪শে আগস্ট পূর্ণ হবে কলকাতা শহরের তিনশ বছর

কলকাতার যানবাহনের ইতিহাস প্রায় এই তিনশ বছরেরই। পালকি থেকে যার শুরু তারই আপাত বিরতি এই পাতাল রেলে। এই ভাবেই চলেছে বিবর্তনের ধারা। কালের যাত্রাপথে যানবাহন গড়ে তুলেছে পরিবহনের রূপ-রেখাটি। কে বলতে পারে আবার নতুন কোন ব্যবস্থা চোখে পড়বে না এই বিশ শতকেরই শেষ লগ্নটায়। এই ভাবেই এক ফাঁকে কলকাতায় চালু হয়ে গেছে অটো রিকশ বা ট্যাক্সী যাই বলো। অটো কলকাতায় বেশ জাঁকিয়েই হাজির হয়েছে।

আমরা তাই অপেক্ষায় থাকতে পারি কি বলো ? নতুন কোন পরিবহন ব্যবস্থা এখানে আবার গড়ে ওঠে সেটাই দেখার জন্য।

কলকাতার যানবাহনের এই হল মোটামুটি ইতিহাস।
